কাব্যপরিক্রমা

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার রামতনু অধ্যাপক
প্রবীণ সাহিত্যিক রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
কর্ত্তৃক ভূমিকা সম্বলিত
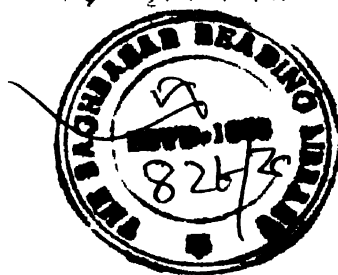
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীঅভিজিৎকুমার চক্রবর্ত্তী
১৫৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বাঁধাই—১৷৷০
সাধারণ—১।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

মুদ্রাকর
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, বি-এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

জন্ম
৪ঠা ভাদ্র ১২৯৩।

মৃত্যু
১৪ই পৌষ ১৩২৫

পরিচয়

আধুনিক ভারতের যতগুলি প্রাদেশিক সাহিত্য আছে, তাহার মধ্যে বাংলা সাহিত্য সমগ্র ভারতবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। বঙ্কিমের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের যুগ অবধি বাংলা সাহিত্যের অগণ্য গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধাদি গুজরাটী, হিন্দি হইতে সুরু করিয়া তেলেগু, তামিল, মালয়ালাম্ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। এই গৌরবের জন্য বাঙ্গালী তথা সমগ্র ভারতবাসী চিরদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী থাকিবে। তাঁ'র অর্দ্ধ শতাব্দীর একান্ত সাধনা ও অপূর্ব্ব মনীষা বাংলা সাহিত্যকে শুধু নিখিল ভারত সাহিত্যের সম্মেলনে গৌরবের আসন দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে কায়েমী আসন স্থাপন করিয়াছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যের এই বিশ্বাতিগতি যে দুই একজন রবীন্দ্র-ভক্তের নিকট পরিস্ফুট হইয়াছিল, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর স্বর্গগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের অন্যতম। মনে পড়ে কবির পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবে সে যুগের শান্তিনিকেতনের এক পর্ণ কুটীরে অজিতকুমার তন্ময় হইয়া তাঁহার **"রবীন্দ্রনাথ"*** প্রবন্ধ

---

* রবীন্দ্রনাথ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

পাড়িয়া যাইতেছেন এবং ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় সুকুমার রায় প্রভৃতি উদীয়মান সাহিত্যিকরা মুগ্ধ হইয়া অজিতকুমারের গভীর বিশ্লেষণের তারিফ করিতেছেন। প্রবন্ধ পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অজিতকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "সত্যিকথা, ভিক্টর হিউগোর পর গদ্যে পদ্যে এত বড় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারো মধ্যে দেখি না।" বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি সভার একটি উজ্জ্বলতম রত্ন, এ বিশ্বাস ও গর্ব্ব টাউন হলের বিরাট সম্বর্দ্ধনা-সভায় স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ পণ্ডিত, ভাবুক ও সাহিত্যসেবীর মুখ দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

অজিতকুমার তাঁহার ধ্যান নেত্রে যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন, সেই কবির গীতাঞ্জলি ইংরাজীতে রূপান্তরিত হইয়া নোবেল পুরস্কারের বিজয় অর্ঘ্য অর্জ্জন করিল। সমগ্র বিশ্ব সাহিত্য মহলে সাড়া পড়িয়া গেল, ভারতের পূর্ব্বাকাশে এক নব জ্যোতিষ্কের সন্ধান মিলিয়াছে। বাঙ্গালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর সেই পরম গৌরবের দিনেও ভক্ত অজিতকুমারকে শান্তিনিকেতনে দেখিয়াছি। দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁর সুরের সাধনায় ডুবিয়া গেলেন, বিশ্বের সম্মান ও সমাদরের ভারে যেন অবসন্ন হইয়া কবি গাহিয়া উঠিলেন।

"এ মণিহার আমায়
নাহি সাজে।"

অমনি গীতিমাল্যের যুগ আরম্ভ হইল এবং অজিতকুমারও সঙ্গে সঙ্গে গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের ভিতর দিয়া পুরানো বৈঠকের শেষ আলাপের সঙ্গে নূতন বৈঠকের বিচিত্র রাগ রাগিণীর রেশ মিলাইয়া দিলেন। সকলে বুঝিল "স্বরের স্বরধুনী" সমানে বহিয়া চলিয়াছে। সুগায়ক অজিতকুমার স্বরের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথকে ধরিতে চাহিতেন বলিয়াই এমন গভীর ভাবে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছিলেন। একদিকে যেমন এই সময়ে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক প্রবন্ধাদির ভিতর দিয়া তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি বড়দিক আমাদের কাছে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিলেন, অন্যদিকে এশিয়ার প্রথম নোবেল-লরিয়েট রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের সাহিত্য ও অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে কি নিবিড়ভাবে যুক্ত আছেন, তাহা এই কাব্যপরিক্রমায় সঙ্কলিত রচনাগুলির ভিতর দিয়া অজিতকুমার দেখাইয়াছেন। সেইজন্য গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের যুগ হইতে পিছু হটিয়া রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বরচিত ধর্ম্ম-সঙ্গীতের ভিতর দিয়া এবং জীবনস্মৃতি, রাজা, ডাকঘর, ছিন্নপত্র প্রভৃতি অপূর্ব্বরচনার তোরণ প্রাসাদাদি অতিক্রম করিয়া "জীবনদেবতার" বেদীর নিকটে আমাদের লইয়া গিয়াছেন। অজিতকুমারের "রবীন্দ্রনাথ" ও "কাব্য পরিক্রমা" বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক ইহাই প্রার্থনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০।

শ্রীকালিদাস নাগ

নিবেদন

এই গ্রন্থের প্রায় সকল প্রবন্ধই 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গত তিন চারি বৎসরের মধ্যে কবিবর রবীন্দ্রনাথের যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি পুস্তকের আলোচনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

আমার প্রিয়বন্ধু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থের নাম-করণ করিয়া আমাকে স্নেহঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। কাশী-পরিক্রমা, ব্রজপরিক্রমা, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের নাম আছে। আমরা যে রবীন্দ্রকাব্যতীর্থ পরিক্রমণ করিতেছি, তাহার এই সামান্য বৃত্তান্তের নাম কাব্যপরিক্রমা রাখিয়া আমার বন্ধু আমার তীর্থ পরিক্রমণ সার্থক করিয়াছেন।

কাব্যের আলোচনার মধ্যে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থের আলোচনা অসঙ্গত বলিয়া কোন কোন পাঠকের মনে হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থের আলোচনাকে বাদ্ দিয়া কেবলমাত্র তাহার কাব্যের আলোচনা সম্ভাবনীয় নহে।

"ধর্ম্মসঙ্গীত" শীর্ষক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে তথাকার সাহিত্যিক ও গুণীজনের দ্বারা তাঁহার বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হইবার উপলক্ষ্যে রচিত হয়। ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণে উহা প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রবন্ধ 'জীবন-দেবতা' সম্বন্ধে একটু নিবেদন আছে। 'জীবন-দেবতা'র তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া অনেকে

উহা নিতান্ত অলস কল্পনামাত্র মনে করেন। এ কালের জীবতত্ত্বে অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা হইতে মনস্তত্ত্বে ব্যক্তিত্বের মূল ও মানব চৈতন্য সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে, 'জীবন-দেবতা'র ভাবের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহার প্রসঙ্গে সেই সকল তত্ত্বের আলোচনা উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। রসাত্মক কাব্যের রসপ্রসঙ্গে এরূপ জটিল তত্ত্বের 'কচ্‌কচি', অনেকের নিকটে অপ্রীতিকর হইতে পারে। আশা করি তাঁহারা আমাকে দয়া করিয়া সহ্য করিতে পারিবেন।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রকাশকের নিবেদন

কাব্যপরিক্রমার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে স্বর্গীয় পিতৃদেবের রচিত ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “রাজা” নাটকের সমালোচনা নূতন সংযোজিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার রামতনু অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। জীবন-দেবতার পরিশিষ্ট সম্বন্ধে একটু বলিবার আছে, স্বর্গীয় পিতৃদেব ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের মত লইয়া পূর্ব্বে জীবনদেবতা রচনা করেন। পরে জীবনদেবতার “পরিশিষ্ট” তিনি নিজেই রচনা সংযোজিত করিয়াছিলেন। ইতি

১লা আষাঢ়, ১৩৪০
কলিকাতা

বিনীত
প্রকাশক

বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে সকল রসতৃষ্ণার্ত্ত পথিক

রবীন্দ্রকাব্যতীর্থ

আমার পূর্ব্বে পরিক্রমণ করিয়াছেন

আমার সঙ্গে বর্ত্তমানে করিতেছেন,

এবং আমার পরে অনাগতকালে করিবেন,

তাঁহাদের হাতে

একজন পথিকের

এই বৃত্তান্ত

সাদরে

উপহৃত

হইল।

সূচী

ভূমিকা

বঙ্গ সাহিত্যে গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত কম। তাহার কারণ আমার বোধ হয় এই যে যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ের অনুশীলন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইংরেজী এবং কোন কোনও স্থলে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ। উপন্যাস, সাহিত্য ও কাব্য এতদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। সম্প্রতি একটু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। সাহিত্য সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন না হইলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে হইলে দু'চারখানি হীরা মতি পান্নার অলঙ্কারও চাই। যে সকল কৃতী লেখক মাতৃ-ভাষা জননীকে এইভাবে সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিধাতার কোন অনির্দ্দেশ্য বিধানে তাঁহাকে অকালে বিদায় লইতে হইল! তাহা না হইলে, তাঁহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্য সম্পদ্ বর্দ্ধিত হইতে পারিত, সাহিত্যের বড় একটি অভাব পূর্ণ হইতে পারিত। তাহার প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' চরিত-গ্রন্থের মধ্যে একখানি অতি সুলিখিত ও বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁহার প্রবন্ধ গুলিতেও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ চিন্তাশীল লেখক আমাদের মধ্যে যে বেশী নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার রবীন্দ্র কাব্য-পরিক্রমা গ্রন্থ পড়িলে মনে হয় যে তিনি যে শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর গদ্য লেখক ছিলেন তাহা

নহে; কাব্যরস আস্বাদন করিবার এবং সকলের সঙ্গে উপভোগ করিবারও অপূর্ব্ব ক্ষমতা তাঁহার ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস-বিশ্লেষণ উপলক্ষে তিনি কাব্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা বঙ্গ সাহিত্যে বড় বেশী নাই। এই জন্যই আমি এই প্রবন্ধগুলির পরিচয়-পত্র লিখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছি। আমি আশা করি, বঙ্গভাষার সেবকগণের মধ্যে এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

কাব্যপরিক্রমা

রাজা

বাংলা সাহিত্যে যে-সকল উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা ও নাটক পড়া যায়, তাহা হইতে বাঙালী-পাঠকের মানসিক স্তর নির্ণয় করিবার জন্য কোন গভীর গবেষণার প্রয়োজন মাত্র করে না। আমাদের ডিমাণ্ড অনুসারেই এ-সকল জিনিষের সপ্লাই হয় সত্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতদিনকার শিক্ষাসত্ত্বেও আমরা instinctএর স্তর বেশী দূর পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া উঠিতে পারি নাই। সেইজন্য আমাদের রুচি যথেষ্ট শুচি হয় নাই, রসবোধ যথেষ্ট গভীর হয় নাই। আমরা যে সকল স্থূল, নিম্ন প্রবৃত্তিময় জীবনের নিতান্ত নিম্নরসের সৃষ্টি করিতেছি, তাহাও আবার এমনি ছায়া-ছায়া ভাসা-ভাসা ও দুর্ব্বল যে মনে হয় সে-সকল সৃষ্টিও বেশীর ভাগ. ক্ষেত্রে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ফল বই আর কিছুই নয়। তাহাদেরও মধ্যে যদি এই শ্রেণীর ফরাসীস্ লেখকের সজীবতা

থাকিত, তবে কথা ছিল না। কবিবর রবীন্দ্রনাথের "রাজা" যে সেই সকল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টির অন্তর্গত নয়; এ নাটকে যে কতগুলি নিতান্ত স্থূল মানুষের রাগদ্বেষ-প্রণয়াদি হাসিকান্নার ব্যাপারের কৃত্রিম উত্তেজনা-পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে না এ যে একেবারেই সেই পুরোণো শ্রেণীর নয় বরং অত্যন্ত আধুনিক আধুনিকতম শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সগোত্র; এই কথাগুলি বুঝাইবার জন্যই আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে আধুনিক নাট্যের স্বরূপ সম্বন্ধে অত কথার আলোচনা করিয়াছি। আধুনিক নাট্য সাহিত্যের মধ্যে "রাজা" নাটকের স্থান কোথায়, ইহার আর্টরূপের কোন বিশিষ্টতা আছে কিনা, ইহার মধ্যে কোন নূতন রস সৃষ্ট হইয়াছে কি না, মানব-জীবনের কোন্ অংশকে ইহা উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়াছে, ইহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কোন নূতনত্ব আছে কি না—এই আলোচনাগুলিতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আধুনিক নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে গোড়ায় একটু মুখবন্ধ করিয়া লওয়া দরকার বোধ করিয়াছি।

"রাজা" অধ্যাত্মরসের নাট্য।—এ নাট্যের অনুরূপ কোন সৃষ্টি সাহিত্যে আছে বলিয়া আমি জানি না। পশ্চিমদেশে থাকিলেও নাটকাকারে নাই, অন্য আকারে আছে। প্রাচীনকালের সেণ্ট অগষ্টিনের Confessions বা দান্তের Vita Nuova এবং একালের ব্লেকের The Marriage of Heaven & Hell বা ফ্রান্সিস্ টম্পসনের The Hound of Heaven,—এ সকলের সঙ্গে এ নাট্যের বিষয়ের কতক কতক সাদৃশ্য আছে। তবে সে

সাদৃশ্য কোন কাজেরই নয় এইজন্য যে, সে সকল গ্রন্থের অধ্যাত্মরসের সঙ্গে এ রসের প্রভেদ যথেষ্ট। শুধু যে ধর্ম্মভেদের জন্য এ ভেদ ঘটিয়াছে, তাহা আমি একেবারেই মনে করি না; কারণ ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের মতগতভেদ যেমনি থাক, অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য সকল দেশের ধর্ম্মসাধনার মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মভেদের জন্য অধ্যাত্মরসের যে ভেদের কথা বলিতেছি তাহা ঘটে নাই। প্রধান যে কারণে ঘটিয়াছে তাহা বলি।

আর্টের সাধনার সঙ্গে অধ্যাত্ম সাধনার একজায়গায় গুরুতর রকমের প্রভেদ আছে। শিল্প সাধকের কাছে। তাহার নিজের বিশেষ রূপটাই বড়; সমস্ত বিশ্বকে সেই রূপের ছাঁচে ঢালাই করিতে পারিলে তবেই তাহার তৃপ্তি। বিশ্ব তার জন্য, সে বিশ্বের জন্য নয়। বিশ্ব তাহার উপকরণ, সে যেমন খুসি তাহাকে গড়িবে, ভাঙিবে। এই জন্যই তাহার কোথাও নিঃশেষে আত্মদান নাই; কেবলি আত্মগ্রহণ আছে। অর্থাৎ সে কেবলি আপনার আধারের মধ্যে বিশ্বকে গ্রহণ করে, বিশ্বকে বিশেষ করিয়া লয়।

অধ্যাত্ম সাধকের পথ একেবারে ইহার উল্টা। তাহার কাছে বিশ্বই বড়; আপনাকে বিশ্বের মধ্যে নিঃশেষিত করিতেই তাহার তৃপ্তি। সে বিশ্বের জন্য, বিশ্ব তার জন্য নয়। বিশ্ব-রূপের কাছেই তার আত্মদান সম্পূর্ণ হইলেই তবেই তাহার সাধনার সম্পূর্ণতা।

তবে সেকালের অধ্যাত্ম সাধনার পথ ঠিক এই পথ ছিল এ কথা বলা যায় না। সে সাধনা প্রধানভাবে বিশ্বের মধ্যে বাড়া ছিল না, বিশ্বকে ছাড়া ছিল। আত্মদান এখনকার মত তখনও তাহার লক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু সে হয় এক অনন্ত, অনধিগম্য, নিরুপাধি ঈশ্বরের কাছে আত্মদান, নয় এক সান্ত, সাকার বিগ্রহের কাছে আত্মদান। সেই জন্যই রূপের সাধনার সঙ্গে অধ্যাত্ম সাধনার ভেদ সেকালে মেলানো শক্ত ছিল। অবশ্য মধ্যযুগে ইউরোপে, কিম্বা বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে, যেখানে চীনে এবং জাপানে যেখানে যেখানে শিল্প ধর্ম্মের সেবা করিয়াছে দেখা যায়, সেখানে সেখানে শিল্প সাধনা ও অধ্যাত্ম সাধনা যে মিলিয়াছে এমন কথা বলা যায় না। বরং সেখানে শিল্প নিজের স্বরূপ খর্ব্ব করিয়া বিশেষভাবে ধর্ম্মশিল্প বা religious art হইয়া উঠিয়াছে, ইহাই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং শিল্প ও শিল্পসাধনা বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, সে সকল যুগের শিল্প ও শিল্প-সাধনা একেবারেই তাহা নয়। তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই; ধর্ম্মের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যে তাহাদের সীমা বাঁধা। এই কারণেই ধর্ম্মের আধিপত্য ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য আর্টের প্রাণপণ প্রয়াস হয় এবং ক্রমশঃ ধর্ম্ম আর্টকে তাহার স্বাতন্ত্রপথে যাইতে না দিলে, আর্টের রস বিকৃত হইতে থাকে এবং সেই রসবিকার তখন ধর্ম্মের মধ্যেও বিকার ঘটায়। ইতালীর এবং ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের যুগে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখা গিয়াছে। আর্টের সাধনা এবং অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে যে পার্থক্য আছে

বলিলাম তাহাকে ভুলিতে গেলেই, কোন গতিকে দুই সাধনাকে এক করিতে গেলেই, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে কাটে।

অথচ একালেই আমরা দেখিতেছি যে, এই দুই সাধনার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা থাকিলে তো চলে না। এখন তো আর জীবনকে পায়রার বাসার মত খোপে খোপে ভাগ করিয়া রাখা সম্ভব নয়। জীবন যে একবস্তু; তাহার মধ্যে এত ভাগ এত ভেদ কেমন করিয়া করা যায়? সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সাধনার ভেদ গুলিকে অস্বীকার করিয়া নয়, বরং পূরা মাত্রায় মানিয়া লইয়াই দেখিতে হইবে সে সমস্ত ভেদের মধ্যে অভেদ কোথায়, ঐক্য-তত্ত্বটী কোনখানে? সেই ঐক্য তত্ত্বটি যেমনি বাহির হইবে, অমনি তাহার রসও আর্টের ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিবে।

"রাজা" নাটকের নাট্য বস্তু এইরূপের সাধনা এবং অধ্যাত্ম সাধনার ভেদ লইয়া এবং এই ভেদজনিত সংঘাতের উপরেই এই নাটকের পত্তন। সুতরাং এ নাটকে যে-সকল রস ফুটিয়াছে তাহা একেবারে নূতন। এ সকল রস যেমন নূতন, যে-সকল চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া এই রসগুলি ফুটিয়াছে তাহাও নূতন। নাটকের প্রধান নায়িকা—সুদর্শনা। রূপের সাধনার যে স্বরূপ বর্ণনা করিলাম তাহাই তাহার চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে। নাটকের প্রধান পাত্র, ঠাকুরদাদা। অধ্যাত্ম সাধনার যে স্বরূপ বর্ণনা করিলাম তাহাই সেই চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ

পাইয়াছে। আর প্রধান অথচ অদৃশ্যনায়ক স্বয়ং রাজা—তাঁহার সম্বন্ধে পরে কথা হইবে।

নাটকের গল্পটী একটী বৌদ্ধজাতক হইতে লওয়া হইয়াছে। মূল গল্পটী নাট্যে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা এই :—

এক কুরূপ বা অরূপ রাজা (মানব হিসাবে ধরিলে কুরূপ, ঈশ্বরের হিসাবে ধরিলে অরূপ) তাঁর "সুদর্শনা" রাণীকে এক অন্ধকার ঘরে আনাইয়া সেইখানে প্রত্যহ তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। তাঁহার প্রতি পরম ভক্তিমতী তাঁহার এক দাসী ছিল ; তাহার নাম সুরঙ্গমা,—সে যৌবনে নষ্ট হইবার পথে গিয়াছিল, তারপর রাজার আশ্রয়ে আসিয়া রক্ষা পায়—রাজা তাহাকে সেই অন্ধকার ঘরের দাসী করিয়া দেন। রাণীর মনে রূপের তৃষ্ণা প্রবল, রাজাকে চক্ষে দেখিতে না পাইয়া রাণীর মন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দাসী সুরঙ্গমার মত অন্ধকার ঘরে রাজাকে ধ্যান করিয়া তাঁর তৃপ্তি নাই। রাণী শেষে রাজাকে ধরিয়া বসিলেন, যে রাজাকে একবার সব জিনিষের মাঝখানে বাইরে আলোয় দেখা দিতে হইবে। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, বেশ, বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে প্রাসাদের শিখরের উপর দাঁড়াইয়া রাণী হাজার লোকের মাঝখানে রাজাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। রাজা তাহাকে ভীড়ের মধ্যে সকলদিক দিয়া দেখা দিবেন।

সে দেশের লোকে কিন্তু রাজাকে কখনো চক্ষে দেখিতে

পায় না—কারণ রাজা যেমন রাণীর কাছে দেখা দেন না তেমনি প্রজাদের কারো কাছেই দেখা দেন না। তাহাদের অনেকেরই তাই সংশয় যে রাজা মোটেই নাই। বসন্ত উৎসবে অন্যান্য রাজারা আমন্ত্রিত, রাজার দেখা না পাইয়া তাহাদেরও মনে সেই সংশয়ই পাকা হইয়াছে। কেবল কাঞ্চীর রাজার মনে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই—লোকটা সংশয়বাদীও নয়—একেবারে নাস্তিক ও বিদ্রোহী বলিলেই হয়।

ইতিমধ্যে বসন্ত-উৎসবে সুবর্ণ নামে এক ছদ্মবেশী এবং সুপুরুষ এবং সেই কারণেই ভিতরে কাপুরুষ ব্যক্তি সে দেশের রাজা বলিয়া নিজেকে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কাঞ্চীরাজের কাছে তার ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে। কাঞ্চীরাজ আসল রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যতই জোর করিয়া অবিশ্বাস করুক, নকল রাজার নকলটুকু তাহার চোখ এড়ায় না। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে লাভ করিবার লোভ রাখে; সুবর্ণকে তার সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সে হাতে রাখিল।

বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে সেই সুরূপ সুবর্ণকে দেখিয়া সুদর্শনা-রাণী তাহাকেই রাজা বলিয়া ভ্রম করিল। সুরঙ্গমা তাহার কাছে ছিল না। রাণী পদ্ম পাতায় ফুল সাজাইয়া সুবর্ণকে রাজা ভ্রমে অর্ঘ্য পাঠাইল। সুবর্ণ তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু কাঞ্চীরাজ বুঝিতে পারিয়া সুবর্ণের গলা হইতে মুক্তার একগাছি মালা নিজে খুলিয়া লইল এবং দাসীর হাত

দিয়া মহারাজের মালা বলিয়া রাণীকে পাঠাইয়া দিল। রাজার হাতের এই অগৌরব রাণীকে বিঁধিল।

তারপর অদৃশ্যরাজার প্রতি অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে পাইবার আশায় প্রাসাদের এককোণে আগুন ধরাইয়া দিতে সে আগুন দেখিতে দেখিতে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে কাঞ্চী নিজে পালাইবার পথ পায় না। বেচারা সুবর্ণ তখন ভয়ে আকুল। রাণী আগুন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার শরণ লইতেই সে তৎক্ষণাৎ কবুল করিল যে সে রাজা নয়। লজ্জায় সুদর্শনা ম্রিয়মান হইল। তারপর সেই প্রলয়ের দিনে আসল রাজার প্রচণ্ড ভয়ানক রূপ সে দেখিতে পাইল—ধূমকেতু-ওঠা আকাশের মতো কাল রূপ। রাজা সেই রুদ্র ভীষণরূপেই রাণীকে প্রবৃত্তির প্রলয়দাহ হইতে রক্ষা করিলেন। তখন রাণীর ভিতরে একদিকে পাপের নিদারুণ দাহ ও লজ্জা অন্যদিকে রূপের তীব্র নেশা। রাজার সেই ভীষণরূপ সে সহ্য করিতে পারিল না। রাজার কাছ হইতে সে দূরে পলাইয়া যাইতে চাহিল।

সুদর্শনা রাজার কাছে থাকিল না। রাজা তাহাকে কোন নিষেধ করিলেন না, তাহার উপর জোর করিলেন না। সুদর্শনার মনে তীব্র অভিমান জাগিয়া উঠিল। তাহার সেই বিদ্রোহের দিনে সুরঙ্গমা তাহার সঙ্গ লইল। সে বলিল তোমার পাপের আমিও ভাগী। আমি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকিব।

স্বাভিমানের সঙ্গ লইল নম্রতা।

সুদর্শনা তখন তাহার বাপের বাড়ী আসিল। রাজার সম্বন্ধে তাহার তখন তীব্র অভিমান ; কারণ বাপের বাড়ীতে তাহার তো আর রাণীর ঐশ্বর্য্য নাই, সেখানে তাহার অগৌরবের স্থান, সেখানে তাহাকে দাসী হইয়া থাকিতে হইতেছে। তাহার যে পতন হইয়াছে এবং সেইজন্যে যে তাহার অহঙ্কার পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সে-কথা বুঝিলেও মানিয়া লওয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। রূপলালসা তখনও তাহার মন হইতে সরে নাই ; সুবর্ণ তখন তাহার কাঙ্ক্ষিত, যদিচ তাহার ভীরুতার জন্য তাহার প্রতি সুদর্শনার ধিক্কার জন্মিয়াছে। পাপের বিদ্রোহের ভিতর একটা সাহস আছে, একটা উত্তেজনা আছে ; সে উত্তেজনা প্রলয় ঘটাইবার উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার ভিতর তীব্র আনন্দ। সেক্সপীয়রের এণ্টনি এণ্ড ক্লিয়োপেট্রার মধ্যে সেই প্রলয়ের তীব্র উত্তেজনার আনন্দের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুদর্শনার বিদ্রোহের মধ্যে সেই সাহস, সেই উন্মাদনা প্রচুর ও প্রবল রূপে জাগিয়াছে কিন্তু যাহার জন্য সে সমস্ত ছাড়িল, সে কোথায় ? সে এমন ভীরু ? সুদর্শনাকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার সাহস তাহার নাই ?

ইতিমধ্যে কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে বাহন করিয়া সুদর্শনাকে লইবার জন্য তাহার পিতার রাজ্যে উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে কাঞ্চী ছাড়া আরও কয়েকজন রাজা আসিল। সেই সাত রাজার সঙ্গে সুদর্শনার পিতার যুদ্ধ বাধিল এবং তিনি বন্দী হইলেন। সুদর্শনার জন্য স্বয়ম্বর সভা প্রস্তুত হইল। সেই

সভায় কাঞ্চীরাজ সুবর্ণকে ছত্রধর করিয়া সিদ্ধিলাভের আশা করিল। রাজসভায় সুবর্ণকে দূর হইতে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহার প্রতি সুদর্শনার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তখন তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল, সুবর্ণ কিছুমাত্র সুন্দর নয়। সে স্থির করিল যে, এই সাত রিপুর সাত রাজার টানাটানির আয়োজনের মাঝখানে সেই স্বয়ম্বর সভায় বুকে ছুরি বসাইয়া সে আত্মঘাতিনী হইবে।

এইখানেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ। তাহার অর্ঘ্য যে সৌন্দর্য্যের অন্তরতর রিক্ত নির্ম্মল "সবরূপডোবানো রূপের" কাছে না পৌঁছিয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের ভোগলালসাপ্রদীপ্ত স্থূল রূপের মলিনতার মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ধূলায় লুটাইয়াছে, যে মূহুর্ত্তে সে ইহা অনুভব করিতে পারিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তো তাহার প্রায়শ্চিত্তের সুরু, মুক্তিরও সূত্রপাত। সৌন্দর্য্যবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন তো পাপ নয়; পাপ—যখন লালসা সৌন্দর্য্যবৃত্তির স্থান জুড়িয়া বসে। সে লালসা নিতান্ত ইন্দ্রিয়ের জিনিয—হৃদয়কে তাহা নষ্ট করিতে পারে না।

তারপর স্বয়ম্বর সভায় হঠাৎ রাজাদের আসন কাঁপিয়া উঠিল এবং যোদ্ধবেশে ঠাকুরদাদা প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কাঞ্চীরাজ প্রভৃতি বসন্ত উৎসবে ঠাকুরদাদাকে কতকগুলি দলবল লইয়া নাচিতে গায়িতে দেখিয়াছে। এখন ঠাকুর্দ্দা যখন বলিলেন, রাজা এসেছেন এবং তাঁহার সেনাপতি তিনিই; তখন কাঞ্চীরাজ সে কথায় ভুলিল না। আর সকল রাজাই ভয়ে তখনি হার

মানিল। কেবল কাঞ্চীরাজ শেষ পর্য্যন্ত লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে বিদ্রোহী, সে পুরাপুরি অবিশ্বাসী।

সুদর্শনার অভিমান তখন যায় নাই। কেবল মনটা ভিতরে গলিয়াছে, পাপের মলা বেদনার অশ্রুজলে ধুইয়াছে। তাহার বিশ্বাস রাজা তাহাকে নিশ্চয় ডাকিয়া লইবেন। সে ঠাকুর্দ্দার মুখে শুনিল, রাজা যুদ্ধ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাহাকে তিনি উদ্ধার করিলেন, কিন্তু ডাকিয়া লইলেন না।

তারপর শেষ দৃশ্যে পরাজিত কাঞ্চীরাজ, ঠাকুরদাদা, রাণী, সুরঙ্গমা সকলেই পথে বাহির হইল। সে পথ যাত্রীর পথ, মুক্তির পথ, বিশ্বের পথ। সকল অভিমান ভাসাইয়া দিয়া সেই পথে রাণী বাহির হইতেই রাজাকে যেন সেই পথেই পাইল। তখন তাহার দীনবেশ, তাহার রথ নাই, তাহার কোন সমারোহ নাই। শেষে রাজার সঙ্গে দেখা মিলিতে রাণী বলিল—আমি তোমার দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও। তাহার আত্মদান এতদিনে সম্পূর্ণ হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে সইতে পারবে? রাণী বলিল পারব। "প্রমোদবনে আমার রাণীর ঘরে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম যেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে! তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম"।

রাজা বলিলেন "তোমারি মধ্যে আমার উপমা আছে"।

সুদর্শনা বলিল, "যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেই খানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই নয় সে তোমার।"

তখন রাজা তাহাকে বলিলেন—অন্ধকারের লীলা এবার শেষ হল। এখন বাইরে চলে এস, আলোয়। নাটকের এইখানে সমাপ্তি।

আমি বলিয়াছি রূপের সাধনা ও অধ্যাত্মসাধনার দ্বন্দ্বের উপরেই এই নাটকের ভিত্তি। সুদর্শনার ভিতর দিয়াই সেই দ্বন্দ্বের লীলা এ নাটকে আমরা দেখিতেছি। তাহার রূপের জন্য প্রবল তৃষ্ণা। প্রথম অবস্থায়, সেই তৃষ্ণা তাহাকে অশুচি অসতী করিল, তাহার প্রমোদ-উদ্যানে আগুন লাগাইয়া দিল, তাহাকে প্রতিষ্ঠাচ্যুত করিয়া সাত রিপুর টানাটানি হানাহানির মাঝখানে ফেলিয়া দিল, তাহার ভিতরে প্রবল আত্মাভিমান জাগাইল। দ্বিতীয় অবস্থায়, অপমান এবং আঘাতের ভিতর দিয়া বাহ্যরূপের কামনা ক্রমে ক্রমে মরিয়া গিয়া "সবরূপ ডোবানো রূপ" অপরূপ রূপ রাণীর মনটিকে ক্রমশঃ অধিকার করিয়া তাহাকে মধুর করিল এবং পরিপূর্ণ আত্মদানে যখন তাহার আত্মাভিমানও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইল, তখনই রাজার সঙ্গে তাহার যথার্থ মিলন ঘটিল। সুদর্শনার পরিণতির ক্রমকে তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। আদিতে, সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা; মধ্যে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া নৈতিক অবনতি,

লালসার অগ্নিকাণ্ড, প্রবৃত্তির বিদ্রোহ; শেষে, দ্বন্দ্বাবসানে মাধুর্য্যে আত্মদান এবং আত্মাভিমানে জলাঞ্জলি, ঐশ্বর্য্যের বদলে দৈন্যকে স্বীকার এবং নিখিল জগতের মধ্যে সেবার অধিকার লাভ। সৌন্দর্য্য হইতে ধর্ম্মনীতিতে এবং ধর্ম্মনীতি হইতে আধ্যাত্মিকতায় এই যে উত্তরণ, ইহা এমন ধাপে ধাপে না ঘটিলে আত্মার পক্ষে অন্ধকার হইতে আলোকে আসা কোনমতেই সম্ভাবনীয় ছিল না। সুদর্শনার ইতিহাস আত্মার এই অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাস এবং এই অভিনব Soul Dramaর প্রধান নাট্যবস্তু।

কিন্তু এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে, যদি রাজার স্বরূপটি কি তাহা না দেখি। সে রাজা কি বেদান্তের অনন্ত, অনধিগম্য, নিরুপাধি ব্রহ্ম না বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ ভগবান? এ নাট্যে রাজার স্বরূপ কি তাহা না জানিলে রাণীর এই আত্মার ইতিহাসের কোন মূল্যই থাকে না।

একমাত্র লোক যিনি রাজাকে চেনেন তিনি ঠাকুরদাদা—সুতরাং তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে রাজার স্বরূপের কোন কোন লক্ষণ পড়িতে বাধ্য।

একেবারে প্রথম দৃশ্যে যখন রাজার এই নূতন রাজ্যে পথিকের দল উপস্থিত তখন তাহারা প্রহরীকে উৎসবে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে। প্রহরী উত্তর করে—"এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছিবে"। এ খোলা রাস্তার দেশ—এ "a open Road"—এখানে কোন মানা বা নিষেধ নাই। রাজাকে কেউ দেখে না তাই কেউ ভয়ও করে না।

রাজা কেন দেখা দেন না তার উত্তরে ঠাকুরদাদা বলিতেছেন—
"সে যে আমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছে।"

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে।
আমরা যা খুসি তাই করি
তবু তাঁর খুসীতেই চরি
মোরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে!"

রাজা সবাইকে বিধি নিষেধহীন খোলা রাস্তায় বাহির করিয়া রাজা করিয়া দিয়াছেন, এতো স্পষ্টই এখনকার democratic ঈশ্বরের কথা। ডিমোক্রাটিক বা গণেশ ভগবানের ধারণা আমাদের দেশে যে নাই তাহা নয়। তাহাকে নরনারায়ণরূপে দেখিবার সাধনা, জীবে জীবে তিনি শিবরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন এ ভাবে দেখিবার সাধনা, তাঁহাকে বিশ্বরূপ করিয়া দেখিবার সাধনা আমাদের দেশের কোন কোন সাধকশ্রেণীর মধ্যে ছিল এবং এখনও আছে। যে যে পথে যায় সে যে তাঁরি পথে চলিয়াছে, সকলেরই পথ যে তাঁরি পথ—একথাও আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনার মুখ্য কথা। তবু মনে হয় যে, ডিমোক্রাসি জিনিষটা পশ্চিমের জিনিষ বলিয়া ডিমোক্রাটিক ভগবানের ধারণা পশ্চিমে যেমন করিয়া জাগিয়াছে, এমন করিয়া আমাদের দেশে কখনো জাগিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সাবেক কালে যখন ব্যক্তিদের তাল পাকাইয়া এক-একটা class

বা জাতি তৈয়ারী করা হইত, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কোন কথাই ছিল না। তখন এ তত্ত্ব কেহ বুঝে নাই যে, মানব সমাজের চালক মানব সমাজ নিজেই—কোন রাজাও নয়, কোন জাতিতন্ত্রও নয়। সমাজের সকল সামাজিকের পরস্পরের সীমাসংখ্যাহীন অদৃশ্য ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ জিনিষটা ক্রমশঃ একটা অখণ্ড বস্তু হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এই সমাজ আত্মক্রীড়, আত্মরতি, আত্মক্রিয়াবান, আত্মঅগ্রসরশীল। অথচ এই সমাজে কেবল মানুষেরই নয়, ইহা অসংখ্য জীবের আছে। সেই নিখিল বিশ্ব সমাজের পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবানের স্বরূপ। সেই নিখিল বিশ্ব সমাজের (cosmic society) অভিব্যক্তি যেমন শেষ হয় নাই, তেমনি সেই সমাজের চিদ্রূপী যে ভগবান তাঁহারও শেষ হইতে পারে না। তিনি সেই ক্রমবিকাশশীল নিখিল বিশ্ব-সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছেন, নিখিল বিশ্বসমাজের সঙ্গে নানা ভোগ ভুগিতেছেন, এবং নিখিল বিশ্ব সমাজের সমস্ত বাধাকে জয় করিয়া করিয়া ক্রমাগতই চলিতেছেন। ইহা একালের Democratic বা গণেশ ভগবানের ধারণা। আমাদের দেশে যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান যে যুগে যুগে ক্রমাগত অবতীর্ণ হইতেছেন, এই ভাবের সঙ্গে পশ্চিমের এই অভিনব ডিমোক্রাটীক ভগবানের ভাবের বেশ মিল। দুইই এক বস্তু। "Democracy : a new unfolding of human power গ্রন্থে অধ্যাপক য়ুডস বলিতেছেন—"This new spirit, forming itself, as it were, upon the restless sea of humanity. Will

without doubt, determine the future sense of god and destiny···Society, as a federal union, In which each individual and every form of human association shall find free and full scope for a more abundant life will be the large figure from which is projected the conception of the god in whom we live and move and have our being."

রবীন্দ্রনাথের "রাজা" একদিকে সকলকে রাজা করিয়া দিয়া সমস্ত মানুষকে বিধিনিষেধহীন "খোলা রাস্তার দেশে বাহির করিয়া দিয়াছেন তিনি এই ডিমোক্রাটীক ভগবান। অন্যদিকে তিনি রাণীর বা আত্মার, একমাত্র স্বামী, একমাত্র প্রণয়ী। আত্মা তাঁহার "উপমা" আত্মা তাঁহারই "সুদর্শনা রূপ"। তাই ঠাকুর্দাও তাঁহার দলের ভিতর দিয়া এই রাজার স্বরূপের এক পরিচয়, সুদর্শনা রাণীর ভিতর দিয়া এই রাজার স্বরূপের অন্য পরিচয়। এই দুই পরিচয়ই সমান সত্য ও মূল্যবান। তিনি বিশ্বরূপ অথচ তিনি বিশেষরূপ। তিনি সমস্ত অথচ তিনি একক। রবীন্দ্রনাথের রাজার মধ্যে এই দুই স্বরূপের মিলন, যেন বাস্তবিকপক্ষে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে রাজার দুই ভিন্ন রকমের স্বরূপবোধের মিলন।

এইজন্য এই নাট্যে ঠাকুর্দ্দার প্রয়োজন আছে রাণীকে; রাণীর প্রয়োজন আছে ঠাকুর্দ্দাকে। ঠাকুর্দ্দা যতদিন রাণীর ভিতর দিয়া রাজাকে দেখেন নাই, ততদিন রাজাকে পূরা করিয়া সমগ্র করিয়া দেখিতে পারেন নাই। আবার রাণী রাজার অন্যস্বরূপ কোনদিনই

বুঝিতেন না, যদি রাণীকেও পথে বাহির হইতে না হইত। এই-রূপে অধ্যাত্মসাধনার প্রয়োজন ছিল রূপের সাধনাকে ; রূপের সাধনার প্রয়োজন ছিল অধ্যাত্মসাধনাকে। যে ঠাকুরদাদা বিশ্বের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন তিনি জানেন নাই যে ত্যাগের শেষেও একটী ভোগ আসে, একবার আপনার আধারে বিশ্বকে নিবিড় করিয়া পাওয়া দরকার। সেই আধার রূপের আধার। পক্ষান্তরে, যে রাণী বিশ্বকে কেবলি বিশেষ রূপ দিয়া সেই আধারে ভোগ করিয়াছে, সে জানে নাই সর্ব্বস্ব ত্যাগ ভিন্ন ভোগের পূর্ণতা নাই, আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া চুকাইয়া দিলে তবেই ভোগের পূর্ণতা।

কেবল রাজার স্বরূপের মধ্যে একটি দিক্ পাই না। এ রাজা দুঃখময় ভগবান নন্, suffering God নন্। জীবাত্মা রাণীর মুখ দিয়া রাজাকে যখন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কেমন দেখতে পাও, কি দেখ ?" রাজা উত্তর করিতেছেন যে, তিনি মানুষকে বিশ্ব-অভিব্যক্তির চরমতম পূর্ণতম রূপ করিয়া দেখিতেছেন। কি আশ্চর্য্য, কি চমৎকার সেই জায়গাটী! রাজা বলিতেছেন, "দেখ্‌তে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটী জায়গায় রূপ ধ'রে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার !" মানুষের সীমাবদ্ধ এতটুকখানি রূপের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের রূপ সমস্ত চন্দ্রসূর্য্যতারার রূপ যে ভরিয়া আছে এবং অরূপ ভগবান্ যে সেইরূপে মুগ্ধ, এমন

কথা এমন আশ্চর্য্য ভাষায় পৃথিবীর আর কোন্ মহাকবি বলিয়াছেন আমি জানি না।

অথচ দেখি, সেই রাজা, সুদর্শনার পতনের পর একেবারে নিশ্চল নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিকার। যে সুদর্শনা "তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার দ্বিতীয়," সে তো দূর নয়, সে তো অন্য নয়। তাহার পাপভোগে কি তাঁহার কোন ভোগ নাই, তাঁহার কোন যন্ত্রণা নাই? রবীন্দ্রনাথের রাজাতো স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত সুদূর ভগবান্ নন্। অবশ্য রাজা সে সময়ে গোপনে সুদর্শনার বাতায়নের নীচে প্রেমের বীণা বাজাইয়া সুদর্শনার ভিতর হইতে তাহার মন গলাইবার চেষ্টা করিলেন এবং সাত রিপু বা সাত রাজার টানাটানির অপমান হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু জীবের মুক্তির জন্য কোথায় তাঁহার বেদনা, তাঁহার ব্যাকুলতা?

আমার মনে হয়, একপক্ষে রাজার প্রেম এমনি নির্ব্বিকার নিরুদ্বিগ্ন প্রেম বলিয়া অন্যপক্ষে সুদর্শনার প্রেমও প্রথম অবস্থায় প্রবৃত্তির অপেক্ষাকৃত নীচের স্তর ছাড়াইয়া খুব বেশী উঁচুতে উঠিতে পারে নাই। অভিমানের আগুণ যখন গলিল, তখনও কোথায় সুদর্শনার প্রেমের গভীর শান্তি, রহস্যগম্ভীরতা, নিবিড় পরিপূর্ণতা, আত্মবিহ্বল রসপ্লাবন? নাটকের শেষের ভাগে এগুলির আভাষ আছে বটে—কিন্তু আরো একটু পূর্ণতর স্ফুটতর প্রকাশ হইলে, সুদর্শনার অধ্যাত্ম-প্রেমের মাধুর্য্য পরিপ্লুত ভক্তিবিনম্র রূপটি আরো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত।

সুদর্শনার পাশাপাশি রাজার দাসী সুরঙ্গমার চিত্রটী কি

আশ্চর্য্য! ঠিক একটি ভক্ত সাধকের চিত্র। তাহার চরিত্রে কোন জটিলতা নাই। এক সময়ে সে পাপের পথে গিয়া ঘা খাইয়া ধর্ম্মের পথে ফিরিয়াছে, তারপর ঐকান্তিক নিষ্ঠাতেই তাহার সমস্ত চরিত্র স্থিতি পাইয়াছে। সে বলিতেছে—রাজার কি অবিচলিত নিষ্ঠুরতা! অথচ বলিতেছে—"এত অটল এত কঠোর ব'লেই এত নির্ভর এত ভরসা।" ক্রমে সেই নিষ্ঠার ভিতর দিয়া সে এক সময়ে অন্ধকার ছাড়িয়া আলোতেই আসিল। অর্থাৎ আপনার ভিতরকার সাধনার নিভৃত বেষ্টনটি ছাড়াইয়া সমস্ত সংসারের ভিড়ের মধ্যেই আসিল। সুদর্শনা যখন রাজার উপর রাগ করিয়া দূরে চলিল, তখন সে বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব। সুদর্শনা বলিল—না, তোকে আমি নিতে পারব না—তোর কাছে থাক্‌লে আমার বড় গ্লানি হবে—সে আমি সইতে পারব না। সুরঙ্গমা বলিল—মা, তোমার সমস্ত ভালমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি।

"আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী
আমি সকল দাগে হব দাগী।"

সুরঙ্গমা এইখানেই তার ভক্তি সাধনার চরম অবস্থায় গিয়া পৌঁছিল। এতদিন সে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাসী ছিল, সে আপনার ভিতরকার সাধনার নিষ্ঠার মধ্যেই স্থির হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিল। এখন সে সংসারে আসিয়া সকলের কলঙ্কভাগী, সকলের পাপের দাহের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কারণ তাহা না হইলে পাপ তো যায় না। পাপ যায় পাপের ভার গ্রহণ করিলে, পাপ যায় প্রেমে। কারণ প্রেমেই ভার লয়, ভার বয়। তাই সুরঙ্গমা গাহিতেছে :—

"আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে
যে পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।"

মানুষের পাপ সম্বন্ধে ঈশ্বরেরও তো ঠিক এই ভাব। নইলে তাঁহারও প্রেমের মূল্য কি? সুরঙ্গমার এই প্রেম, এই অচল নিষ্ঠাই সুদর্শনাকে ভিতরে ভিতরে গলাইয়াছে। অবশ্য সুদর্শনার পরিবর্ত্তন তাহার মত এমন সহজে ঘটিবারই নয়। কারণ, তাহার অভিমানের আয়োজন অত্যন্ত বিচিত্র, তাহার পক্ষে অভিমান ত্যাগ বড় কঠিন; তাই তাহার অধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তণ ঘটনাও কঠিন সে যে অন্ধকারকেই চায় না, অর্থাৎ সে সাধকদের মত অরূপকে শুধু অন্তরের ধ্যান লোকের মধ্যে দেখিতে চায় না। সুরঙ্গমা বলে—"আমার বোঝবার জন্য কিছুই দরকার হয় না। আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।" সুদর্শনা ঠিক তার উল্টা কথা বলে—"যেখানে আমি গাছপালা পশু পাখী মাটি পাথর সমস্ত দেখ্‌ছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।"

সুদর্শনার মত বিদ্রোহী কাঞ্চীর রাজা; যদিচ তাঁহার Type স্বতন্ত্র। রাজাদের মধ্যে তাহারো পরিবর্ত্তন ঘটান তুল্য

কঠিন। কারণ আর সবাই মূঢ় সংস্কারের বশবর্ত্তী—তাহারা রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও যেমনি শোনে যে, রাজা আসিয়াছেন অমনি মাথা নীচু করে। কিন্তু কাঞ্চী শেষ পর্য্যন্ত অটল। এই বিদ্রোহ আত্মশক্তির উপর ষোল আনা নির্ভরের জন্য বিদ্রোহ। সুতরাং এ বিদ্রোহ প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙে। শেষ দৃশ্যে যখন সকলেই Pilgrims Progress এর মত রাজার দর্শন লাভের জন্য পথে চলিয়াছে, তখন কাঞ্চী বলিতেছে:— "যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতে চাইনি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মত এসে এক মুহূর্ত্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানার জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নাই।"

কাঞ্চীরাজার বিদ্রোহ সুদর্শনার চেয়ে ঢের জোরালো। সে রাজার রাণীকেই জোর করিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে এবং সেজন্য কত কলকৌশলের অবতারণা করিয়াছে। সে ঈশ্বরকে চায় নাই, ঐশ্বর্য্যকে চাহিয়াছে। সে ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া ঈশ্বরের জায়গায় নিজেকে বসাইতে চাহিয়াছে। এবিদ্রোহ শেষ পর্য্যন্ত লড়ে, তারপরে মরে।

এইবার ঠাকুর্দ্দার কথা এবং তার দলের কথা বলিয়া এ নাটকের কথা শেষ করিব। গ্রীক নাটকে কোরাসের যে কাজ ছিল, ঠাকুর্দ্দা ও তাহার দলের ঠিক সেই কাজ এ নাটকে দেখিতে পাই। এ নাটকে লিরিক অংশের সন্নিবেশ ঐখানে।

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ লিরিক কবি নাটকের

মধ্যে, গল্পের মধ্যে, এমন কি উপন্যাসের মধ্যেও মূল প্লটের সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছায়াপ্লট সর্ব্বদাই গাঁথা থাকে—ড্রামার সঙ্গে সঙ্গে একটা গীতি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা-নাট্যে বসন্ত উৎসবের অবতারণা এবং ঠাকুর্দ্দার দলের অবতারণা এ নাটকের সেই লিরিকভাগ এবং বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ।

গ্রীক কোরাসের আসল অর্থ ছিল নৃত্য কিম্বা নৃত্যের রঙ্গমঞ্চ। গ্রীক দেবতাদেব উৎসবে নৃত্য একটা বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। এই নৃত্য হইতেই ক্রমে গ্রীক নাট্যের উৎপত্তি। গোড়ায় নৃত্যে কোন কথা ছিল না—ক্রমে নাট্যের উৎপত্তি হইতে কোরাসের মুখে কথা জোগাইল। এই কোরাস গ্রীক নাট্যে একটা বিশেষ লিরিক রস সঞ্চার করিয়াছিল।

গ্রীক ড্রামা হইতে এই কোরাসের ভাব লইয়া যে রবীন্দ্রনাথ "রাজা" নাট্যে ঠাকুর্দ্দার দলটীকে আনিয়াছেন তাহা বলি না। ইহা নাটকের একটী গভীরতর প্রয়োজন হইতে আসিয়াছে। গিলবার্ট মারে গ্রীক কোরাসের যে প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন তাহাও এখানে কতকটা খাটে। তিনি বলিয়াছেন, "It (chorus) will translate the particular act into something universal." কোরাস একটা বিশিষ্ট ঘটনাকে বিশ্বব্যাপক করিয়া তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রয়োজন এই যে, সকল নাট্যদৃশ্যের পিছনে একটি অদৃশ্যসত্তার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে।—সে দ্রষ্টা, সে সাক্ষী। নাট্যের সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া যে চরম পরিণাম বা

climaxটি তৈরী হইয়া উঠিতেছে, সে তাহার সবটাই যেন জানে। তাহার কাছে যেন রঙ্গমঞ্চের সকল দৃশ্য, সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ, নেপথ্য পর্য্যন্ত অনাবৃত। নাটকের সে বিচিত্র রসকে সে আপনার অখণ্ড দৃষ্টির দ্বারা এক রস করিয়া লয়। মধ্যে মধ্যে তাই এই কোরাস আসাতে সেই অখণ্ড রসটি অখণ্ড সুরটি সকল বিচিত্রতার ভিতরে ভিতরে জাগিতে থাকে বলিয়া নাটক জিনিষটা নাটক থাকিয়াও একটি লিরিকের সম্পূর্ণতা লাভ করে।

ঠাকুর্দ্দা একটি মুক্ত-আত্মা—সর্ব্বদাই আনন্দিত। তাঁহার সকলের মধ্যে প্রবেশ অত্যন্ত স্বচ্ছ অবাধ এবং সহজ—কারণ তাঁহার বিশ্বের কাছে আত্মদান একেবারে সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভাল মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ
দিবা রাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।"

বসন্তোৎসবে এই তাঁর নাচের গান। রাজা নাটকে এই কোরাসের গান।

অথচ ঠাকুর্দ্দা বসন্তোৎসবে আনন্দ করিতেছেন বলিয়া দুঃখের কথা মোটেই বিস্মৃত নন। তাঁহাকে যখন কেহ আসিয়া ছেলের

মৃত্যু সংবাদ দিতেছে এবং রাজাকে সেজন্য অবিশ্বাস করিতেছে—তিনি তখন উত্তর দিলেন—"ছেলেত গেলই, তাই বলে ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব!" সে ব্যক্তি বলিল, "ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!"

ঠাকুরদাদা বলিলেন—"ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অন্ন-রাজাকেই খুঁজে বের কর! ঘরে বসে হাহাকার কর্লেই ত তিনি দর্শন দেবেন না।" তারপর গাহিতেছেন :—

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলারে?
দেখিসনে কি শুকনোপাতা ঝরা ফুলের খেলারে!
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগ্‌ছে সারা বেলারে।
বসন্তে আজ দেখরে তোরা ঝরা ফুলের খেলারে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মাণিক জ্বলে!
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলারে!
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধজনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলারে
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলারে!"

এ গানের চেয়ে "ঝরাফুলের মেলা" এবং "লক্ষ মাটীর ঢেলা" পৃথিবীর ব্যর্থকাম অবোধজনদের সান্ত্বনার গান কি দুনিয়ায় আর কাহারো দ্বারা কোথাও রচিত হইয়াছে? এতবড় ভরসার কথা

পশ্চিমে ডিমোক্রাসির জয়গান যিনি করিয়াছেন, সেই মহাকবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটী কবিতার মধ্যেও নাই।

এখনকার কালের সভ্যতার বসন্ত-উৎসব যে এই "লক্ষ মাটীর ঢেলা" জনগণকে লইয়া। এই যে সবাই চলিয়াছে, খোলা রাস্তার দেশে পা ফেলিয়া ফেলিয়া। একালের democratic stateএর ভাগ্যবিধাতা তো কোন একজন মানুষও নয়, কোন একদল মানুষও নয়। এই কারণে সকলেরই মনে কত সংশয় হয়, কত ভয় হয়। মনে হয়, "সবাই রাজা" ভাল, না "এক রাজা" ভাল? অথচ বিজ্ঞ, অবিজ্ঞ, সুনীতিপরায়ণ, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থপর, পরার্থপর, দেশহিতৈষী, দেশবিদ্রোহী, ভালমন্দমাঝারি, বাল বৃদ্ধ, নর নারী—এই সমস্ত স্তূপ মিলিত হইয়াই আজ তাহা "মানব ভাগ্যবিধাতা" হইয়াছে। এই স্তূপের ভিতরেই ভগবান, এই স্তূপ ভগবানের ভিতরে। ইহার মধ্যে কাহাকে বাদ দিবে, কাহাকেই বা অবজ্ঞা করিবে? বিবেকানন্দের ভাষায়—এ সমস্তই যে ব্রহ্ম; এ সবই যে নারায়ণ।

ঠাকুর্দ্দা তাই গাহিতেছেন :— ভয় নাই, ভাবনা নাই—

"কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ!"

ঠাকুর্দ্দার এই কোরাসের সুর আগাগোড়া সমস্ত নাটকটীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত। শেষ পর্য্যন্ত এই সুর।

আমি বলিয়াছি ঠাকুরদাদার প্রয়োজন ছিল সুদর্শনাকে, সুদর্শনার প্রয়োজন ছিল ঠাকুরদাদাকে।

সুদর্শনার পাপের মূলই তাহার আত্মভিমানে। তাহার কাছে তাহার নিজের রূপটাই ছিল বড়—সে বিশ্বকে সেইরূপের ছাঁচে ঢালাই করিতে চাহিয়াছিল। সকল আর্টিষ্ট প্রকৃতিই তাই চায়। সে তো রাজার কাছে কোনদিনই আপনাকে নিঃশেষে দান করে নাই; সে রাজাকেও আপনার রূপ দিয়া কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহাকে আপনার বিশেষ ভোগের সামগ্রী করিতে চাহিয়াছিল। আত্মাভিমানেই আত্মাভিমানের ক্ষয়। তাহার প্রবৃত্তির তাহার ভোগলালসার আগুন জ্বালাইয়া সে যখন রাজাকে দেখিল, দেখিল তিনি "ঝড়ের মেঘের মত কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো, তারই তুফানের উপর সন্ধ্যার রক্তিমা," তখন সে যে "ননীর মত কোমল, শিরিষ ফুলের মত সুকুমার, প্রজাপতির মত সুন্দর" সৌন্দর্য্যালোকটি কল্পলোকটি তৈরি করিয়াছিল। তাহা Tennyson এর Palace of Art এর মত এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সৌন্দর্য্যের মধ্যে এতদিন সে শুধু দেখিয়াছিল মনোহর অংশটুকু এখন সৌন্দর্য্যের অন্তরতর প্রচণ্ড রুদ্র অংশকেও সে দেখিতে পাইল।

এই আত্মাভিমানটাই জীবের কাছে ভগবানের সকলের চেয়ে বড় প্রার্থনার জিনিষ। এইটিই পাত্র, যে পাত্রে তিনি অমৃত পান করেন; এইটিই দর্পণ, যে দর্পণে তিনি আপনার রূপ আপনি দেখেন। ঠাকুরদাদার এইটিই ছিল না—সেইজন্য সুদর্শনাকে দেখিবার আগে বসন্ত-উৎসবে হোলির মাতামাতির রাতে তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁর মন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল—

"পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে ওরে কোন্ গহনে ?"

তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে—

"কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা
বাহির অঙ্গনে সঙ্গী সনে।"

কিন্তু—

"উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে
কে লয়ে যাবে সে ভবনে
কোন্ নিভৃতে ওরে কোন্ গহনে ?"

সকল ত্যাগের শেষে যে একটী ভোগ আছে, নিজের আধারটী প্রস্তুত না থাকিলে সে ভোগ ত পূর্ণ হয় না। ঠাকুর্দ্দাকেও তাই শেষকালে পথে বাহির হইতে হইল দলবল সব পিছনে পড়িয়া রহিল। সুদর্শনাকেও পথে বাহির হইতে হইল—কিন্তু সে পথে আরো সহ-যাত্রীর দল সঙ্গে চলিয়াছে। দু-জনের দু-রকমের মুক্তি !

রাজা নাটকখানি সম্বন্ধে আমার আলোচনা এখানেই শেষ করি। হিমালয় পর্ব্বত কেমন, লোকমুখে তাহার গল্প শোনার চেয়ে নিজে গিয়া একবার দেখিয়া আসা ভাল। যাহারা যাহারা হিমালয় ভ্রমণ করিয়াছে, তাহারা পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিলে তাহাদের কত আনন্দ ! তাই আমার এ আলোচনা যদি "রাজা" পড়িতে কাহাকেও উৎসাহিত করে, তবেই আমার এ আলোচনা আমি সার্থকজ্ঞান করিব।

জীবন-দেবতা

মানুষের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা বিশেষ বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের অধিকারের অন্তর্গত ছিল; বংশানুক্রমে তাহারাই সে বিদ্যার চর্চ্চা করিত এবং তাহাকে নিজেদের বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া কল্পনা করিত।

এখন নাকি গণতন্ত্রের যুগ, এখন সকলেরই সব বিষয়ে অধিকার। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাকেও, প্রত্যেককে প্রত্যেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ মেলামেশা করিতে হইতেছে। ধ্যানের অভ্রভেদী শিখরে তাহারা আর অনধিগম্য হইয়া নাই, তাহারা এখন সমতলে নামিয়া আসিয়া ধারার সঙ্গে ধারাকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানেই এইরূপ সঙ্গম হইতেছে, সেখানেই মানুষ তাহাদের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য অভাবনীয় রূপ দেখিতেছে। সেখানেই তীর্থ, কারণ, সেখানে স্বাতন্ত্র্যবোধ লুপ্ত হইয়া ঐক্যবোধ প্রত্যক্ষ প্রকাশমান হইতেছে।

হুইটম্যানের একটি কবিতা আছে, তাহার নাম "There was a child went forth everyday"—একটি শিশু প্রত্যহ বাহির হইত। কবি বলিতেছেন, সে যাহাই দেখিত, তাহাই হইত। প্রভাতের সূর্যোদয়ের অরুণচ্ছটা, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, বিহঙ্গের কাকলি, বৃক্ষলতা, সকল ঋতুর সকল আশ্চর্য্য দান, ফলশস্যের বিচিত্র সম্ভার; সহরের রাজপথের লোকারণ্য, গৃহের পিতামাতা আত্মীয়স্বজন পৌরবর্গ—সকল দৃশ্য, সকল শব্দ, সকল ভাব, সকল অনুভাব—তাহার অঙ্গীভূত অংশীভূত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রত্যহই এই সমস্ত গ্রহণ করিত, সে প্রত্যহই বাহির হইত।

কবি-কথিত এই শিশুটি কে? কে বাহির হইয়াছে? আধুনিক মানুষ। সে সব চায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যাহা কিছু আছে, মানুষের সমাজে যাহা কিছু হইতেছে, সে-সমস্তই 'আমার' এই চিহ্নে সে চিহ্নিত করিয়া দিতে চায়। শুধু আমার বলিয়া সে ক্ষান্ত নহে, সে-সমস্তই তাহার 'আমি'—তাহারই ব্যাপ্তি তাহারই বহিঃপ্রকাশ—এত বড় কথাটা না বলিলে তাহার চলে না। 'আমার' বলিলে সেগুলি বাহিরের বিষয়সম্পত্তির মত মনে হয়, কিন্তু 'আমি' বলিলে আর তো কোনো কথা নাই। তখন তাহাকে বিভক্ত করিবে কে, খণ্ডিত করিবে কে?

সমস্তকে যে নিজের চেতনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখা চাই—এ ভাব এ যুগের মানুষের মধ্যে ফুটিল কেমন করিয়া? ফুটিল, যতই বিদ্যাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ প্রশস্ততর

হইতে লাগিল—বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন, দর্শনের সঙ্গে শিল্পসাহিত্য যতই ক্রমশঃ সাহচর্য্যে ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে দীক্ষিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক বিদ্যার পন্থা, প্রকরণপদ্ধতি এবং আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের কাজ একই। মানুষের মনের ক্ষেত্রকে, চেতনার পরিধিকেই তাহারা বিস্তৃততর করিয়া দিতেছে। সুতরাং তাহারা যে যাহাই অন্বেষণ করুক এবং যে যাহাই সিদ্ধান্ত স্থির করুক, তাহারা মানুষের মনকেই নানাদিক্ দিয়া নাড়া দিয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিতেছে। এবং সেজন্য প্রত্যেক বিষয়েই যে-সেই মনঃশক্তির বল ও প্রসারই বাড়িয়া যাইতেছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'র ভাবের অনেক সাক্ষ্য যে আধুনিক কালেরই একটী বিশেষ জিনিষ, তাহাই দেখাইবার জন্য আজ আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। আমি জানি যে, কবিতার মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্বেষণ করার বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই। কারণ, কবিতা তত্ত্বকে তো প্রমাণ করে না, সে তত্ত্বকে রূপ দান করে সব সময় যে তাও করে তাহা নহে—তত্ত্ব হোক বা না হোক্, একটা কিছু যে-কোন রসবস্তুকে সে আপনার কল্পনার ও ভাবের ছাঁচে ফেলিয়া একটি সুষমাময় রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই খুসী হয়। সে ভাবকে চায় না, অভাবনীয়কে চায়—নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বকে চায় না, অনির্ব্বচনীয়কে চায়। এইজন্যই, সে যে রসরূপের সৃষ্টি করে, তাহার মধ্য হইতে তাহার আসল ভাবটা কি, তাহা উদ্ধার করা এত কঠিন হয়। মুখের মধ্যে

যেমন মনের নানা ভাবের আলোছায়াপাত দেখা যায়, কবিতার মধ্যে তেমনি ভাবের নানা ইসারা-ইঙ্গিত মাত্র দেখা যায়, কিন্তু তার বেশি নয়। সুতরাং দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাকে মিলাইতে গেলে অত্যন্ত অসঙ্গত একটি কাণ্ড ঘটে।

এসকল কথা মানিয়া লইলেও বলিতে হয় যে, কবিতার মধ্যেও সত্য আছে, সে যে কেবলি মায়ার সৃষ্টি তাহা নহে। আমাদের মনের নানান্ মহলে যে সত্যের নূতন নূতন রূপ। কোনোটা বা মস্তিষ্কের মহাল, কোনোটা বা হৃদয়ের মহাল— কিন্তু এই বিচিত্রতায় সত্য কিছু বিভিন্ন হইয়া যান না। ইসারায় বলিলেও সত্য, কূটতর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া বলিলেও সত্য, প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা, যন্ত্র দ্বারা দেখাইলেও সত্য। জগতের রূপ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, সুতরাং তাহা মিথ্যা— জগতের বাস্তবিক সত্তার মধ্যে রূপের কোনো সদ্ভাব নাই—এ কথা যত বড় দার্শনিকই বলুন না কেন, ইহা সত্য নয়। কারণ, রূপ শুধু চোখে দেখিবার ও ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিবার জিনিস হইলে, মানুষ কখনই বলিত না, "জনম অবধি হম্ রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।" রূপের মধ্যেই যে অরূপের বাসা, সে যে ভিতরেরই বাহির, সত্তারই প্রকাশ। কবিতা শুধুই প্রকাশ, আর কিছুই নয়, একথা তেমনিই সত্য নহে—কারণ, কবিতাও সত্যেরই প্রকাশ।

সুতরাং 'জীবন-দেবতা'র আইডিয়ার সঙ্গে যদি দর্শনবিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখা যায়, তবে ইহাই বলিব, যে, এ আই-

ডিগ্রাটী সত্য, এ নিছক কল্পনা নয়। কবি এই সত্যকে অনুভূতির দিক্ হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। তিনি ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তত্ত্ব গড়েন নাই।

এখন প্রস্তাবিত বিষয়ে অবতরণ করা যাক্।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন : –

"এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনা শোনা। বহুযুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলুম, অন্ধজীবনের গূঢ় পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলুম। মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত নবপল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষার মেঘের ঘন নীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখী ক'রে বস্‌লেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে।"

সকলেই জানেন যে কবির "জীবন-দেবতা" শীর্ষক কবিতা-গুলিতে শুধু নয়, 'বসুন্ধরা' 'প্রবাসী' প্রভৃতি আরও অনেক কবিতায় এই পত্রে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে সেই ভাবের কথাই পাওয়া যায়। কবি বলেন যে, আমাদের এই বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে একটি চিরন্তন জীবন আছে। আমার যে জীবন কত যুগ পূর্ব্ব হইতে কত বিচিত্র জীবপর্য্যায়ের ভিতর দিয়া আমার এই বর্ত্ত-মানতায় আসিয়া আজ পৌছিয়াছে, আমার সেই জীবনই আমার

অন্তর্নিহিত চিরন্তন জীবন। কবি তাহারি আশ্বাসে পূর্ণ হইয়া বলেন :—"যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে" এবং "স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে"। এবং এই ক্ষণিক জীবনের স্বল্পপরিসর চেতনার মধ্যে, সেই জন্যই তিনি বিশ্বচেতনাকে এক এক সময় অনুভব করিয়া থাকেন।

ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদে বলে যে, এক আদিম জীবকোষ হইতে এই নানা বিচিত্র জীবদেহ সকল উদ্ভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সে কথা অধুনা সকলেই দেখিতেছি মানেন।* আদিম অ্যামিবা (Amœba) এবং জটিল মানবদেহ একই উপাদানে গঠিত, একই জীবকোষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। এই জীবকোষ বা প্রটপ্ল্যাজ্‌মিক্ সেল্, ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর ব্যূহ রচনা করিয়া জীবকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছে। মানুষের শরীরে, বিশেষভাবে মানুষের মস্তিষ্কে, ইহার জাল যেরূপ ঘন এবং ক্রিয়া যেরূপ দ্রুত ও গতিশীল, এমন অন্য জীবদেহে বা জীব-মস্তিষ্কে নহে। আর সেই জন্যই মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব হইয়া উঠিয়াছে।

ডারুইন্, ওয়ালেস্ প্রভৃতি অভিব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণের এই সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি লক্ষিত হয় না। মানুষ যে বিচিত্র জীবজন্মের মধ্য সম্ভাবিত হইয়াছে, এ কথাটা সত্য বলিয়া মানা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং

* এই প্রবন্ধটি যখন রচিত হয় তখন সকলেই মানিতেন।

ডারুইনের এই মত আশ্রয় করিয়া কেহ যদি বলেন যে 'আমি এক সময়ে গাছ ছিলাম,' তবে শুনিতে যতই অদ্ভুত লাগুক্, রাগ করা মূঢ়তা এবং উপহাস করা ততোধিক মূঢ়তা।

কিন্তু এ কথাটা যে অনেকের অদ্ভুত লাগে, তাহার কারণ ইহা নয় যে বৃক্ষজীবনের মধ্য দিয়া ক্রমে মনুষ্য-জীবনের অভিব্যক্তি হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তটি কোনো মানুষ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহার আসল কারণ এই যে মানুষ বলিতেছেন, আমি গাছ হয়ে উঠেছিলুম—'আমি' উঠেছিলুম এই বোধটা। আরো অধিক কারণ এই যে, সে-কথাটা সেই মানুষের আবার "অল্প অল্প মনে পড়ে।"

"আমি গাছ হয়ে উঠেছিলুম" বলিলে বুঝায় যে 'আমি'র ধারাটা যেন গাছ পর্য্যন্ত প্রবাহিত, অর্থাৎ গাছের মধ্যেও এই আমি-বোধটা কোনো না কোনো আকারে ছিল। অথচ তাহা কেমন করিয়া হয়? আমি-বোধটা তো অচেতন বোধ নয়, সংস্কার মাত্র নয়, সে পূর্ণ সচেতন বোধ। প্রকৃতিরাজ্যে এ বোধের স্থান নাই—কারণ, সেখানে সমস্তই নিয়মে চলে; অন্ধকারের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। স্বাতন্ত্র্যবোধের, কোনো স্থানই সেখানে নাই।

তারপর "সেই পরিচয়ের কথা অল্প অল্প মনে পড়ে"—এ কথারই বা অর্থ কি? আমাদের স্মৃতি কতদূর পর্য্যন্ত যায়? এই কয়েক বৎসরের জীবনে আমাদের মধ্যে যত বস্তু, যত ভাব ও অনুভাব, যত কল্পনা প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বারো আনা

অংশ ভুলিয়াছি, এবং কেবল চারি আনা অংশের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া আসিয়াছি বলিয়া বাল্যের সঙ্গে যৌবনকে, যৌবনের সঙ্গে বার্দ্ধক্যকে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ করিতে পারিতেছি। পৈতৃক নানা সংস্কার তো আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু তাহার সবগুলি কি আমাদের জ্ঞাত? যে সকল স্মৃতির উপর সেই সংস্কারের ভিত্তি—সে সকল স্মৃতির কোনো বার্ত্তাই কি আমরা জানি? পিতা গেলেন, তারপর পিতামহ—তখন তো আরও অজ্ঞাত। প্রপিতামহ—আরও অজ্ঞাত। ক্রমে ঊর্দ্ধে গিয়া নিজের বংশের আদি পুরুষ পর্য্যন্ত পৌছিলাম। তারপর তাঁহাকে ছাড়াইয়া নিজের জাতির আদিপুরুষ পর্য্যন্ত গেলাম। ধর, প্রথম আর্য্যপুরুষ যিনি ছিলেন, তাঁহার কথাই কল্পনা করি। তাঁহার সম্বন্ধে স্মৃতি তো দূরের কথা, তাঁহা হইতে আগত কোনো সংস্কারের সংবাদ কি আমি জানি? তারপর, আরও যুগ যুগ পূর্ব্বে প্রথম মানব, তারপর যুগ যুগ পূর্ব্বে নানা জীবপর্য্যায়, তারপর আরও কত যুগ পূর্ব্বে উদ্ভিদ-পর্য্যায়—তারপর, সেই কোন আদিম যুগে সেই প্রথম তরুটি—তাহার কথা "অল্প অল্প মনে পড়ে" এ কথাটা কি কেহ দিবালোকে বসিয়া কল্পনা করিতে পারে, না লিখিতে পারে? এক পুরুষের স্মৃতিই যখন থাকে না, তখন যুগযুগান্তর পূর্ব্বের স্মৃতি থাকে এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়? তবে কবিত্বের মদ্যপান করিলে এবং কল্পনার গঞ্জিকা সেবন করিলে সমস্তই সম্ভব হয়—সাধে শেক্‌স্‌পীয়র—

"The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact"—

বলিয়াছেন? সুতরাং কবি যদি বলেন যে, "আমি এক সময়ে গাছ হয়ে উঠেছিলুম" এবং সে কথা "আমার অল্প অল্প মনে পড়ে"—তবে শেক্‌স্‌পীয়রের ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য কল্পনা করিবা কথাটাকে তলাইয়া ভাবিয়া দেখিবার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না। ও আবার একটা কথা!

অথচ অভিব্যক্তিবাদের আদিগুরু ডারুইন্‌ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী তাঁহার চেলারা, যাঁহারা Post-Darwinians নামে খ্যাত—তাঁহারা এই কথাটাকেও যে স্থানে স্থানে আমল না দিয়াছেন এমন নয়। আমি বলিয়াছি যে, কবির কল্পনা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমর্থন করেন, এমন ব্যাপার এ যুগের পূর্ব্বে আর ঘটে নাই। এ যুগে হইলে মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র অমন নিশ্চিন্ত মনে কবির সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যটি বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কারণ, এ যুগের মহাকবি স্পষ্টই উল্টা কথা লেখেন; তিনি বলেন—

"A poet never dreams:
We prose folk do: we miss the proper duct
For thoughts on things unseen."—ব্রাউনিং।

অতএব এ যুগের মহাকবির এই আশ্বাসবাক্যকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া দেখা যাক্‌ কবিকথিত আদিম যুগে এই গাছ হইয়া উঠার ব্যাপার এবং সেই যুগান্তরের স্মৃতিকে বহন করিবার

ব্যাপারের মধ্যে ডারুইন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ কি সত্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন। ডারুইনের পরে ক্রমে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের লেখার মধ্য হইতে এই ভাবের সমর্থনকারী কথাসকল আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব, তাহা প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি।

প্রত্যেক মানুষ যে একটিমাত্র ব্যক্তি নয়, কিন্তু অনেক ব্যক্তিত্বের সমষ্টি এবং এই প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বের যে স্বতন্ত্র বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্মৃতি ও সংস্কার রহিয়াছে, আধুনিক মনস্তত্ত্ব এমনতর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডারুইন্ এই কথাটিকে নানা স্থানেই মানিয়া লইয়াছেন দেখা যায়। তিনি বলেন—

"An organic being, is a microcosm, a little universe, formed of a host of self-propagating organisms, inconceivably minute, and numerous as the stars in heaven."—অর্থাৎ বিচিত্র অঙ্গবিশিষ্ট দেহী একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ, তাহা স্ব স্ব প্রধান বহু দেহের সমষ্টিদ্বারা গঠিত এবং সেই দেহগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহারা ধারণার অতীত এবং আকাশের তারার ন্যায় অগণিত।

আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন—

"শরীরতত্ত্ববিদ্গণ সকলেই একথা স্বীকার করেন যে আমাদের দেহের নানান্ অঙ্গসকলের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে,—প্রত্যেকটি জীবকোষের কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বলিয়া ধরা যাইতে পারে; সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর ভর করিয়াই

বলা যায় যে প্রত্যেকটি জীবকোষ একটি স্বপ্রধান স্বতন্ত্র ব্যক্তি”—ইত্যাদি।

জীবকোষের স্বাধীন অস্তিত্বের মত বহু পূর্ব্ব হইতেই বৈজ্ঞানিক সমাজে চলিয়া আসিতেছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেকটি স্নায়ুকেন্দ্রে (nervous centre) স্মৃতি স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করে। যেমন, আঙ্গুলে ঘা হইয়াছে, ঘা সারিয়া যাইবার পরে ক্ষতের চিহ্নিত স্থানটা শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। তাহার অর্থ এই যে, সেই চিহ্নিত অংশটুকুর মধ্যে ক্ষতের স্মৃতি জাগরূক হইয়া থাকে। এতো একটা সহজ প্রমাণ, এরূপ নানা প্রমাণের দ্বারা শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং এই সকল প্রমাণসহায় হইয়াই প্রত্যেকটি জীবকোষ যে একটি স্বপ্রধান স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ডারুইন্ এ মতটিও প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আমাদের মধ্যে এই বহু ব্যক্তির সমাবেশের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, আরও অনেক কথার আলোচনার মধ্যে যাইতে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্য যখন জন্ম লাভ করে, তখন হইতে তাহার সকল জীবনী ক্রিয়া এমন সহজভাবে সম্পাদিত হয় যে তাহার কোনো চেষ্টা খাটাইবার বা বুদ্ধি খাটাইবার প্রয়োজনই হয় না। শিশু অনায়াসে নিশ্বাস গ্রহণ করে, মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ চুষিয়া লয় এবং গলাধঃকরণ করে, পরিপাক করে, কাণে শোনে,চোখে দেখে ইত্যাদি—কিন্তু এতগুলা কার্য্য সে যে আপনিই করিতে পারে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, এগুলি

সংস্কাররূপে তাহার মধ্যে আসিয়াছে। আর আমরা, ইহাও দেখিয়াছি যে, যখনই কোনো কার্য্য এরূপ অভ্যাসগত হইয়া যায়, যে আর চেষ্টা বা চিন্তা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনমাত্র থাকে না, তখনই তাহা যথার্থরূপে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু সেরূপ সংস্কার দাঁড় করানো কি এক আধ দিনের কাজ? তাহার জন্য বহু বৎসর, হয়ত বহু যুগও লাগিতে পারে। অতএব, শিশুর জীবনী প্রক্রিয়া বহুকাল ধরিয়া হইয়া আসিয়াছে এবং সেই অনেক কালের অভ্যাসের ফলস্বরূপে সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই জীবনচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছে। এখন এই সংস্কারকে যদি পূর্ব্ব পুরুষের সংস্কার বল, তবে তাহা অসঙ্গত হয় না; যদিচ বৈজ্ঞানিক ভাবে বলিতে গেলে এই কথাই বলা উচিত, যে, তোমার বিশেষ বিশেষ জীবকোষ বহুকাল ধরিয়া এই এক ধরণের জীবনচেষ্টায় অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং এই সকল অভ্যাসের স্মৃতি তাহার মধ্যে সংস্কারের আকার ধারণ করিয়াছে।

সুতরাং ডারুইন্ যখন বলিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে, অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ বিদ্যমান—প্রত্যেক জীবকোষই এক একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তি—তখন তাহার অর্থ এই যে, প্রত্যেকটি জীবকোষ আপনার বিশিষ্টতার একটি ধারাকে তাহার আরম্ভকাল হইতে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মনে করা ভুল হইবে যে, সেই বহুপূর্ব্বেকার কোনো জীবকোষ এবং এখনকার জীবকোষ একই বস্তু—তাহাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ঘটে নাই। কত লক্ষ লক্ষ জন্মের স্রোতের

মধ্য দিয়া তাহাকে প্রবাহিত হইতে হইয়াছে বাহিরের কত অবস্থার বিপর্য্যয়, কত পরিবর্ত্তনপরম্পরা তাহাকে আঘাত করিয়াছে—সুতরাং যে জীবকোষ সেই আদিম কোন্ যুগে আপনার জীবনলীলা সুরু করিয়াছিল, সে যে আজিও সেই একই ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলা যায় ?

তথাপি অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও জীবকোষের যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা রহিয়াছে এবং সে যে তাহার জীবনী ক্রিয়ার একটি অখণ্ড সংস্কারকেও বহন করিয়া চলিয়াছে,—যে জন্য তাহার প্রাণরক্ষিণী ক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইতেছে, সে বিষয়ে আর ভুল নাই।

ইহার আর একটি প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান প্রমাণ ভ্রূণতত্ত্বে (Embryology) পাওয়া যায়। একটি উন্নত জীব অভিব্যক্তির যে যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, গর্ভে অবস্থানকালে তাহার ভ্রূণ, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই অবস্থার রূপ পরে পরে ধারণ করে। গোড়ায় তাহাকে এমিবা বা মৎস্যজাতীয় জীবের ন্যায় দেখিতে হয়, তারপর সরীসৃপের মত, তারপর পাখীর মত, এমনি করিয়া নানা আকারের ভিতর দিয়া সে নিজের বিশিষ্টদেহ লাভ করে। এই মতটিকে সে শাস্ত্রে বলে recapitulation theory অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির মত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কেন কোনো জীবের ভ্রূণ এই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিবে ? তাহার সেসব পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে তাহার তো শ্রেণীগত পার্থক্য হইয়া গিয়াছে ?

স্যামুয়েল বাটলার নামক বিখ্যাত ডারুইন্-শিষ্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

"If the germ of any animal now living is but part of the personal identity of one of the original germs of all life whatsoever, and hence, if any now living organism must be considered as being itself millions of years old, and as imbued with an intense though unconscious memory of all that it has done sufficiently often to have made a permanent impression, if this be so, we can answer the above question perfectly well." অর্থাৎ, এখনকার কোনো জীবিত প্রাণীর বীজকে যদি সেই বিশ্বজীবনধারার কোনো আদিম বীজের সঙ্গে আংশিক ভাবে এক বলিয়া ধরা যায়, এবং সেই হেতু, যদি এই বর্ত্তমান জীবিত প্রাণীকে কোটি বৎসর বয়স্ক বলিয়া মনে করা যায়, এবং মনে করা যায় যে, সে এই সুদীর্ঘকাল এমন সকল কাজ করিয়াছে যাহা তাহার মধ্যে চিরকালের মত মুদ্রিত হইয়া আছে—আর সেই নিগূঢ় অথচ নিশ্চেতন স্মৃতিতে সে পরিপূর্ণ—তবেই ঐ উপরের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর প্রদান করা যাইতে পারে।

তারপরেই তিনি বলিতেছেন—

"I suppose, then, that the fish of fifty million years back and the man of to-day are one single

living being in the same sense or very nearly so as the octogenarian is one single living being with the infant from which he has grown." অর্থাৎ, আমার তাই মনে হয় যে পঞ্চাশ কোটী বৎসর পূর্ব্বের যে মৎস্য এবং আজিকার যে মানুষ সে একই অখণ্ড প্রাণী ; যেমন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ তাহার আপনার শৈশবকালের শিশুর সঙ্গে একই ব্যক্তি।"

স্যামুয়েল বাট্‌লার ডারুইনের ঐ জীবকোষের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্বের মতটিকে এই দিক্ দিয়া মানেন, যে, তাহার মধ্যে যেটা instinct অর্থাৎ সংস্কার সে তাহার বহুযুগের সঞ্চিত স্মৃতি বই আর কিছুই নহে। তিনি 'instinct'কে বলেন 'inherited memory' এবং 'unconscious memory' অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষাগত স্মৃতি এবং সুপ্ত স্মৃতি বই সংস্কার আর কিছুই নয়। ডারুইন্ দেখাইয়াছেন যে, যখন জীবকোষগণ কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া এমন একটি সংস্কারের ধারা অনুসরণ করে, যাহার সঙ্গে অন্য শ্রেণীর প্রাণীর সংস্কারের ধারার একেবারে মিল হয় না তখন সেই ভিন্ন শ্রেণীর (speciesএর) প্রাণীদিগকে জোর করিয়া মিলাইলে তাহাতে অত্যন্ত কুফল দৃষ্ট হয়। কাছাকাছির মধ্যে বর্ণসঙ্কর চলে, অত্যন্ত দূরবর্ত্তীদের মধ্যে চলে না। স্যামুয়েল বাটলার বলেন যে তাহার কারণ দূরবর্ত্তীদের মধ্যে স্মৃতির ধারা উল্টা ও বিপরীত, সেই জন্য তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মিলাইলে স্মৃতিভ্রংশ হইয়া যায় এবং সেইরূপ দূরসঙ্করজাত জীব তাহার আদিম অপরিণত অবস্থা

প্রাপ্ত হয়। যাহাই হোক্, এই unconscious memory অথবা নিশ্চেতন স্মৃতির মতকে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রযত্ন করিয়াছেন বলিয়াই স্যামুয়েল বাটলারের নাম পশ্চিমদেশে বিখ্যাত।

ডারুইন্ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের এই মতটির সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতার' ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

বৈজ্ঞানিক চক্ষে ডারুইন্ দেখিলেন, প্রত্যেক জীবকোষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, সুতরাং একই মানুষের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে—অথচ তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় নাই, একই অখণ্ড জীবনের মধ্যে বিধৃত হইয়াছে। কবির অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন,—বিশ্ব-অভিব্যক্তির নানা ধারায় তাঁহার যুগযুগান্তরের জীবন প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নানা জীবনের নানা ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে; অথচ তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় নাই—একই অখণ্ড "জীবন-দেবতা" তাহাদের সকলকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন।

"আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি,
জনতা বাহিয়া শুধু চিরদিন
তুমি আর আমি এসেছি!"

ডারুইন্-শিষ্য স্যামুয়েল বাটলার দেখিলেন, প্রত্যেক জীব-কোষের অখণ্ডধারা যে একই সংস্কারের পথ অনুসরণ করিয়া চলে,

তাহা তাহার বহুযুগের অভ্যস্ত জীবনী ক্রিয়ার স্মৃতি বই আর কিছুই নয় এবং জীবভ্রূণে অভিব্যক্তির নানা অবস্থার পুনরাবৃত্তির মধ্যেও সেই স্মৃতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়; সুতরাং জীবকোষের ধারা একটি যুগযুগান্তরের অভ্যাসগত সুপ্ত স্মৃতিরই ধারা। কবি রবীন্দ্রনাথও অনুভব করিলেন, যে সেই নানা সুপ্তস্মৃতি তাঁহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব বিশ্বৈক্যানুভূতির সৃজন করিয়াছে। এ অনুভূতি কল্পনা নয়, এ সত্য যে :—

"দেখি চারিদিক পানে
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে।
তোমার আমার অসীম মিলন
যেনগো সকল খানে।

হে চিরপুরাণো চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া!

"প্রাচীনকালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী
পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিনী!

পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমারি স্মৃতি !
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া !"

শুধু স্যামুয়েল বাটলার যে এই সুপ্ত স্মৃতির মত প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, আধুনিক্ মনস্তত্ত্বে Sublimical consciousness অর্থাৎ মগ্নচৈতন্য বলিয়া একটা কথা বলে। অর্থাৎ আমাদের চৈতন্যের সবটাই আমাদের কাছে প্রকাশ নয়, অনেকটাই অপ্রকাশ। অপ্রকাশ বলিয়াই যে তাহা অনুপস্থিত এবং তাহার কোনো কাজ নাই, এমন কথা বলা চলে না। এ কি রকম ? না, উপমাচ্ছলে বলা যায় যে সমুদ্রের তলে যে সব দেশ তৈরি হইতেছে তাহারা যেমন অগোচর, এই মগ্নচৈতন্যও তেমনি অগোচর। দূর হইতে কুহেলিজড়িত বিশাল এক নগরের ক্ষীণাভাসে যেমন সবই অস্পষ্ট নয়, মধ্যে মধ্যে দুটা একটা সমুচ্চ চূড়া, দুটা একটা বড় বড় কীর্ত্তিচিহ্ন যেমন দেখা যায়—অথচ আর সবই ছায়াময়—মগ্নচেতনার রাজ্য কতকটা সেইরূপ।

যদি অভিব্যক্তিবাদ মানি, এবং যেরূপ দেখিলাম, যদি জীবনের ও জীবনী ক্রিয়ার অভ্যস্ত স্মৃতির অখণ্ড ধারাকে মানি,

এবং মানি যে, আমাদের মধ্যে নানা ব্যক্তিত্বের সমাবেশ সেই অভিব্যক্তির সূত্রে ঘটিতে পথ পাইয়াছে—তবে একথা না মানিয়া কোথায় যাইব যে, আমাদের চেতনাও অনবচ্ছিন্ন? তার মানে, আমাদের যেটুক চেতনা স্বাধীনভাবে আপনার বুদ্ধি ও ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেছে, তাহার অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড চেতনা পূর্ব্ব-স্মৃতির সংস্কারকে বহন করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং প্রচ্ছন্ন ভাবেই কাজ করিয়া যাইতেছে। জন্ম মানেই একটা নূতন করিয়া আরম্ভ করা—সুতরাং সেই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মগ্নচেতনার যুগযুগান্তরগভীর অতলতার উপরে একটুখানি দ্বীপের বেষ্টনের মধ্যে সচেতন হইয়া জাগিয়া উঠি এবং সেই অল্প একটু চেতনাকে সমগ্র চেতনা বলিয়া ভ্রম করি। একজন লেখক বলিয়াছেন:—"Birth is the end of that time when we really knew our business, and the beginning of the days wherein we know not what we would do"—জন্ম হইতেছে একটা কালের শেষ, যখন আমরা আমাদের কার্য্য কি তাহা জানিতাম এবং অন্য এক কালের আরম্ভ যখন আমরা জানি না আমরা কি করিব! সুতরাং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন জীবনধারার কথা, অথবা যাহা একই কথা, জীবন-দেবতার কথাকে ভুলিয়া যদি বর্ত্তমান জীবনকেই একান্ত করিয়া আমরা দেখি, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

এই মগ্নচেতনার তত্ত্বকে মানিলে স্মৃতি সম্বন্ধেও আমাদের

পূর্ব্বের সংস্কারকে ভাঙিতে বাধ্য হইতে হয়। দেখা গিয়াছে যে বহু পুরাতন স্মৃতিও একেবারে বিলুপ্ত হয় না, যদিচ বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্বের কোনো চিহ্নমাত্র থাকে না। হয়ত একটা গন্ধ একজন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধাকে বাল্যের এমন কোনো ঘটনা মনে করাইয়া দেয়, যাহা তাহার মনে পড়িবার কোনো কারণই ছিল না। প্রত্যেকের জীবনের কতকগুলি বাঁধা অভ্যাস আছে, এবং সেই বাঁধা অভ্যাসের স্মৃতি তাহার মধ্যে দিব্য জাগরূক থাকে। অথচ যখন এমন কোনো স্মৃতি মানুষের মনে পড়ে যাহা ভাবের অনুবন্ধিতার নিয়মে তাহার পরিচিত অভ্যাসের কোথাও ধরা দেয় না, তখন তাহা কোনো একটি ইঙ্গিতে (suggestion এ) মগ্নচেতনার রাজ্য হইতে উঠিয়া আসিয়াছে ছাড়া আর কি কারণ নির্দ্দেশ করা যায়? সুতরাং স্মৃতি যে কত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়া আবার জাগ্রত হইতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া নির্দ্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু জড়বস্তুর মধ্যেও স্মৃতির সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন। যে জায়গায় কোনো একটা ধাতু পদার্থ এক সময়ে আঘাত পাইয়াছে, বহু বৎসর পরে সেই জায়গায় সেই আঘাতের স্মৃতির পরিচয় সে প্রদান করিয়া থাকে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বুঝা যাইবে যে জাগ্রৎ চেতনার রাজ্যেই যে স্মৃতির ষোল আনা আধিপত্য তাহা নহে সুপ্ত বা মগ্নচেতনালোকে তাহার আধিপত্য বড় সামান্য নহে। অর্থাৎ জাগ্রতই বলি বা সুষুপ্তই বলি, সমস্ত চেতনাই এক অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন

চৈতনা। যতদূর দেখা যাইতেছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান এই কথাটা প্রমাণ করিবার দিকেই চলিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক জগতে ফেক্‌নার (Fechner) সর্ব্বপ্রথমে এই সত্যটি ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিশ্বজগতে সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে সবধর্ম্মতা বিরাজমান রহিয়াছে, ফেকনারের ইহাই একমাত্র প্রতি-পাদ্য বিষয় ছিল। তিনি বলিতেন, যেমন চোখের সঙ্গে দৃষ্টি, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শ সংযুক্ত রহিয়াছে, অথচ এই সকল ইন্দ্রিয় বিভিন্ন, ইহাদের চেতনাও বিভিন্ন,—যদিও আশ্চর্য্য এই যে আমাদের মনে এই ভেদ মিলিয়া গিয়া সমগ্র শরীরের এক চৈতন্য অনুভূত হয়—ঠিক তদ্রূপ আমার চৈতন্য, তোমার চৈতন্য, প্রত্যেক মানুষের চৈতন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও অবচ্ছিন্ন হইলেও এক অখণ্ড মানব-চৈতন্যের মধ্যে মিলিয়া যায়। মানস-চৈতন্য যেমন ঐন্দ্রিয়-চৈতন্যের পার্থক্যসকলকে মিলাইয়া লয়, মানব-চৈতন্য তেমনি ব্যক্তিগত মানস-চৈতন্যের পার্থক্য সকলকে মিলাইয়া লয়। মানব-চৈতন্য আবার সেই একই প্রণালীতে পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতার জীব-চৈতন্যে মিলিয়া যায়, জীব-চৈতন্য সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহমণ্ডলের বিশ্ব-চৈতন্যে পর্য্যবসিত হয়, এইরূপে চৈতন্য "from synthesis to synthesis and height to height, till an absolutely universal consciousness is reached."—সমন্বয় হইতে সমন্বয়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হয় যাবৎ পর্য্যন্ত বিশ্ব-চৈতন্যের অখণ্ড সমগ্রতা সে লাভ না করে।

ফেক্‌নার চৈতন্যের ক্ষেত্রকে এইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত করিয়া

দেখিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীকে তিনি জড়পিণ্ড মনে করিতেন না। তিনি পৃথিবীকে মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণবান্ চেতনাবান্ সত্তা বলিয়া বোধ করিতেন। আমাদের শরীরের মধ্যে কত অসংখ্য জীবাণুর কি প্রচণ্ড আন্দোলন রহিয়াছে, অথচ আমাদের শরীর দেখিয়া তাহা কেন বোধগম্য হয় না? শরীর সেই অসংখ্য বৈচিত্র্যকে সরল করিয়া মিলিত করিয়া লইতে পারিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর তো কোনো কারণ নাই। সেইরূপ এই অগণ্য জীবশরীরকে পৃথিবী আপনার বৃহৎ শরীরের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে, তাই সমগ্র পৃথিবীর শরীরে জীবনচাঞ্চল্য কিঞ্চিন্মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের হস্তপদের দ্বারা অঙ্গসঞ্চালন আবশ্যক, পৃথিবীর সেরূপ আবশ্যকতা নাই - কারণ তাহার হস্তপদ সর্ব্বত্রই ; তাহার লক্ষ লক্ষ চক্ষু এবং কর্ণ—সে আপনার অংশবিশেষের অর্থাৎ মানুষের অসম্পূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুকরণ করিতে যাইবে কেন?

ফেক্নারের এই চৈতন্যময় বিশ্বপুরুষের আইডিয়ার সঙ্গে গীতার 'বিশ্বরূপের' এবং উপনিষদীয় 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'র ভাবের সম্পূর্ণ মিল পাই। বিশ্ব যে সর্ব্বত্র এক চেতনাবান্ পুরুষের সত্তা দ্বারা ওতপ্রোত এবং আমরা সকলেই যে তাহার অন্তর্গত এ কথার আভাস উপনিষদের নানা শ্লোকের মধ্যে আছে।

মুণ্ডকোপনিষদে আছে :—

> অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
> দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্যপদ্ভ্যাং
পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥

অর্থাৎ অগ্নি (দ্যুলোক) ইঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুদ্বয়, দিক্‌সকল কর্ণদ্বয়। প্রকাশিত বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী অর্থাৎ মাটি উৎপন্না হইয়াছে—ইনি সমুদয় প্রাণীটির অন্তরাত্মা।

এ কেবল কল্পনা মাত্র নহে ইহাও বিশ্বকে সেইরূপ অখণ্ড চৈতন্যবান্ প্রাণবান্ সত্তারূপে উপলব্ধি, যাহা ফেক্‌নার করিয়াছেন দেখা গেল।

'জীবন-দেবতা'র ভাবের সঙ্গে ফেক্‌নারের যে তত্ত্বটি এতক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলাম, তাহার কি খুবই সাদৃশ্য নাই? জীবনদেবতা মানে একটি "ever evolving personality" ক্রমশঃ উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্ব। কোন্ আদিম যুগ হইতে এই 'আমি' নামক ব্যক্তিটির প্রথম সূচনা হইয়াছিল তাহা কে জানে! আমার বর্ত্তমান দেহের জীবকোষসমূহের মধ্যে সেই বহু বহু প্রাচীন যুগের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া নানা জীব-জীবনযাত্রার সংস্কারসকল সুপ্তস্মৃতিরূপে আজিও বিদ্যমান, তাহা দেখা গেল। সেইজন্য সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার আপনার এমন একটা অন্তরতম যোগ যে আমি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিয়া থাকি, ইহা কল্পনা নয়; ইহা আমার দেহাভ্যন্তরের সমস্ত অব্যক্ত প্রাণের অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় স্মৃতি হইতে স্পন্দমান এক আশ্চর্য্য অনুভূতি!

কিন্তু সেই যুগযুগান্তর হইতে প্রবাহিত এই জীবনধারার অন্তর্নিহিত সত্তাই যদি জীবন-দেবতা হন্, তবে তাঁহাকে আমার বর্ত্তমান আমিত্বের এই খণ্ড চেতনাটুকুর মধ্যে উপস্থিত করিবার এবং উপলব্ধি করিবার কোনো প্রয়োজন তো দেখা যায় না। আমি যে সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা আবার অতিক্রম করিবার আমার আবশ্যক কি? তরু-লতা-পশু-পক্ষীর সঙ্গে ঐক্যানুভূতির প্রয়োজন কি? তাহা আর কোনো কারণে নয় কেবল এইজন্য যে, আমি যে মনে করিতেছি যে আমার বর্ত্তমান জীবনের প্রয়োজনের সীমার মধ্যে আমার যেটুকু জাগ্রৎ চেতনা খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাই আমার সব চেতনা—তাহা প্রকৃতপক্ষেই ভুল। আমার চেতনার ক্ষেত্র যে কোন্ সুদূর অতীত হইতে কোন্ সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত, সে কথাটা বুঝিতেই পারিব না। আমায় তাই এই কথাটি জানিতেই হইবে যে, সেই অখণ্ডবিশ্বচৈতন্যলাভপ্রয়াসী একটি সত্তা আমার মধ্যে চিরকাল ধরিয়া কেবলি আমার জীবনকে গড়িতেছেন, কেবলি তাহাকে বিশ্বের সঙ্গে নানা সম্বন্ধসূত্রে বাঁধিয়া সকল ভেদসীমা দূর করিয়া দিতেছেন। আমাকে অভিব্যক্তির কত স্তরের মধ্য দিয়া তিনি লইয়া আসিয়াছেন, আমার মধ্যে সেই সমস্ত জীবনযাত্রার অব্যক্ত সংস্কার মগ্নচেতনালোকে মজুত রহিয়াছে—এখনও এই জীবনেও—যেখানে আমার চেতনার প্রসার ব্যাহত, সেইখানে তাহাকে দূর করিবার জন্য তিনি ভিতর হইতে কেবলি

আমাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র ঠেলা দিয়া বাহির করিতেছেন। There was a child went forth every day. তিনিই জীবন দেবতা; তিনি চলিয়াছেন "from synthesis to synthesis and height to height till an absolutely universal consciousness is reached." সমন্বয় হইতে সমন্বয়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে, যাবৎ পর্য্যন্ত না বিশ্ব-চৈতন্যের অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করা যায়।

"হে চিরপুরাণো চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।"

ফেক্‌নার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণে ও চৈতন্যে পূর্ণ করিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং আমাদের মানস-চৈতন্য যে ক্রমে ক্রমে চক্র হইতে পরিবর্দ্ধিত চক্রে আরোহণ করিয়া সেই বিশ্ব-চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিতেছে, ইহাও তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। অর্থাৎ অভিব্যক্তির আরম্ভ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত,—অসংহত জ্যোতিঃপিণ্ড 'নেবুলা' হইতে আর সুসভ্য মানুষের উদ্ভব পর্য্যন্ত যে একটি ধারা চলিয়াছে—মানুষ সেই ধারাটিকেই পুনরায় অনুসরণ করিয়া আপনার সঙ্গে সমস্ত বিরাট বিশ্বের অখণ্ড যোগ অনুভব করিতে চাহিতেছে। যাহা সে হইয়া আসিয়াছে, তাহা সজ্ঞান ভাবে জানিবে এবং পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। এই জন্য এক সময়ে যাহাকে সে জড় বলিয়া

অবজ্ঞা করিয়াছিল, আজ তাহারই মধ্যে প্রাণের আশ্চর্য্য লীলা দেখিতেছে। যাহা বিস্মৃত বিলুপ্ত ছিল, তাহা জাগ্রৎক্ষেত্রে আসিয়া রহস্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া দিতেছে। সমস্ত চেতনা যে এক অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন চেতনা, এই তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিবার দিকে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমস্তই এখন প্রবল বেগে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে।

চেতনা সম্বন্ধে যেমন ফেক্‌নারের তত্ত্ব কি তাহা দেখা গেল, তেমনি আধুনিক কালের দার্শনিক আঁরি ব্যার্গসঁ সে সম্বন্ধে কি বলেন তাহা দেখা যাক্।

ব্যার্গসঁ বলেন, চেতনা মানেই স্মৃতি। যে চেতনায় অতীতের কোনো সাক্ষ্য নাই সে চেতনাই নয়,—সে তো প্রতি মূহূর্ত্তেই জন্মিতেছে এবং মরিতেছে।

অথচ চেতনার মধ্যে ভবিষ্যতের একটা প্রতীক্ষাও আছে। কিন্তু অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এত গায়ে গায়ে লাগাও, যে, তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেমন ধর, 'আমি ভাল আছি,' তখন একটু পূর্ব্বেই ভাল ছিলাম এবং পরমূহূর্ত্তেও ভাল থাকিব, এই দুইটা আশ্বাস ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে এমন অব্যবহিতভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে তাহাদের বিযুক্ত করা এক প্রকার অসম্ভব। ব্যার্গসঁ সেই জন্য বলিয়াছেন যে, "consciousness is a hyphen between past and future"—চেতনা অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে একটা হাইফেনের মত। তিনি বলেন, "জড়ের সঙ্গে চেতনার প্রভেদ এইখানে যে, চেতনার দ্বারা আমার খুব

অল্প সময়ের মধ্যে, মুহূর্তের মধ্যে, জড়রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কোটী, কোটী ব্যাপার, যাহা পরে ঘটিয়াছে, তাহাকে ধারণার মধ্যে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই। এই মুহূর্তে আমি চক্ষু দ্বারা যে আলোককে দেখিতেছি তাহার মধ্যে কত সুদীর্ঘকালের ইতিহাস সংহত ভাবে নিহিত হইয়া আছে; কত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ঈথরের কম্পন-মালা, যাহা আমি গণনা করিতে গেলে আমার লক্ষ বৎসর লাগিবে। অথচ আমি এক মুহূর্তে এত বড় কাণ্ডটা অনুভব করিতে পারিতেছি! দৃষ্টির ন্যায় অন্যান্য চেতনা সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়।" সুতরাং ব্যার্গসর মতে চেতনা মানেই অনেকখানি ব্যাপারকে একটুখানির মধ্যে ধরা—জড়রাজ্যে যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সম্পাদিত হইতেছে তাহাকে এক মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করা। তাহাকে ব্যার্গসঁ নানাস্থানে কোথাও impulse অর্থাৎ প্রৈতি বলিয়াছেন, কোথাও intuition অর্থাৎ হৃদ্‌স্থিত সহজ ও অখণ্ড বুদ্ধি বলিয়াছেন—অর্থাৎ তাঁহার মতে চেতনা, বিশ্ব-অভিব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিরই প্রেরণা। এইজন্য ব্যার্গসঁ Creative Evolution গ্রন্থে লিখিয়াছেন—অভিব্যক্তির মধ্যে সৃজনীশক্তি চেতনারূপে লীলা করিতেছে, ইহাই তিনি প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যোগী। জড় এই সৃষ্টির প্রেরণার উপকরণ মাত্র। কোথাও কোথাও চেতনা জড়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জড়স্বভাবাপন্ন হইয়াছে,—কিন্তু তাহার নিয়ত চেষ্টাই এই যে, সে উপকরণের ঊর্দ্ধে উঠিয়া আপনার অনির্ব্বচনীয় অবন্ধন রূপকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে। এ যেন

কবিতা—তাহার প্রাণই আসল, ভাষা তাহার উপকরণ; যেখানে তাহার প্রাণ পূর্ণ জাগ্রত, সেখানে ভাষার দেহ সেই প্রাণে প্রাণিত, যেখানে প্রাণ সুপ্ত, সেখানে ভাষাই সব হইয়া উঠিয়া গতিহীন নিশ্চলতা ও মৃত্যুর আকার ধারণ করে।

ব্যার্গসঁর সম্পূর্ণ মতটি এখানে প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব, কারণ তাহা এক কথায় দুকথায় সারিয়া দিবার মত নহে। তবে যতটুকু বলা গেল তাহাতে আমরা দেখিতেছি যে ব্যার্গসঁ চেতনাকে যে সৃষ্টি প্রেরণা বলিয়াছেন, "জীবন-দেবতা'র আইডিয়ার সঙ্গে তাহার বেশ মিল আছে। সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে এই চেতনার ধারাই তো জীবনে জীবনে আমাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে: সে কত কি আনিয়াছে, কত সংস্কার জমাইয়াছে, কত ফেলিয়াছে, কত গড়িয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত তাহার সেই সৃষ্টির কাজ ক্ষান্ত নাই। সে সমগ্র চেতনাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লাভ করিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াই চলিবে। একদিকে তাহার অনাদি অতীত, অন্যদিকে অনন্ত ভবিষ্যৎ।

"এখনি কি শেষ, হয়েছে প্রাণেশ
যা কিছু আছিল মোর?

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আন নবরূপ আন নবশোভা

> নূতন করিয়া লহ আরবার
> চির পুরাতন মোরে।
> নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
> নবীন জীবন-ডোরে।"

আমি যে 'জীবন-দেবতা' লইয়া এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিলাম, তাহা দেখিয়া অনেক কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। রসের দিক দিয়া কবিতার এক প্রকার উপভোগ আছে এবং তাহাই যে তাহার শ্রেষ্ঠ উপভোগ সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, কবিতা শুধুই রস কিন্তু সত্য নয়,—এমন করিয়া দেখা আমি যথার্থ দেখা বলিয়া মনে করি না। তাহার মাহাত্ম্যই তাহার প্রকাশে, সেইখানেই তাহার রস, এবং তত্ত্বপদার্থ তাহার মধ্যে একেবারেই গৌণ—ইহা স্বীকার করিলেও তাহাকে সত্তাবর্জ্জিত প্রাণবর্জ্জিত রূপ মাত্র মনে করিয়া আমি কোনো সান্ত্বনা লাভ করি না। আমার বিশ্বাস এই এবং "জীবন-দেবতা"র আলোচনায় এক্ষেত্রে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে বড় কবিমাত্রেই জানিয়া এবং না জানিয়া তাঁহার কালের সকল দিক্‌কার সকল প্রয়াসের মধ্যে, সাধনার মধ্যে ও চিন্তার মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া থাকেন। আমি যে সকল চিন্তার ধারা অনুসরণ করিলাম, হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছিলেন বলিয়া এই জীবন-দেবতার ভাব তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছে—কিন্তু তাহা না হইলেও আপনা-আপনি

আপনার কবিত্বের অন্তর্দৃষ্টি হইতেই এই ভাব তাঁহাকে অধিকার করিতে বাধ্য—যখন এই ভাবের বাষ্প সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া আছে দেখিতে পাই। এই জন্যই বড় কবিকে seer বা দ্রষ্টা বলে—তিনি নদীর মত তাঁহার কালের নিম্নস্তরে গভীরভাবে প্রবাহিত সকল ভাব-উৎস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। যাহা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে তাহাকে তিনি সংহত করিয়া এক করেন। আর এই জন্য বড় কবির সমগ্র জীবনের ভিতর হইতে সমুদ্ভূত কোনো আইডিয়াকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একমাত্র নির্ব্বোধ ও প্রাকৃত জনের দ্বারাই সম্ভব। অতঃপর "জীবনদেবতা"র রহস্য কিছু কিছু উদ্ঘাটিত হইলে তাহা খুবই আনন্দের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

ডাকঘর।

"We live within the shadow of a veil that no man's hand can lift Some are born near it, as it were, and pass their lives striving to peer through its web, catching now and again visions of inexplicable thing ; but some of us live so far from the veil that we not only deny its existence but delight in mocking those who perceive what we cannot"

—Laurence Alma Tadema

(১)

উপরের কয়েকটি ছত্র পাঠ করিয়া সমালোচনা লিখিতে আর ভরসা হয় না, কারণ 'veil' এর কাছাকাছি আছি এমন

কথাতো বলিতে সাহস হয় না। অবগুণ্ঠনের ভিতরকার কথাতো কিছুই জানি না। তবে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের পরিহাস করিতে আনন্দ পাই, এত বড় বর্ব্বরতার অপবাদ ঘাড়ে করিতে রাজি নই।

যাঁহারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাঁহারা ফুলকে ছিঁড়িয়া তাহার অংশপ্রত্যংশের কোন্‌টার কি কাজ তাহা বুঝাইয়া দেন। কিন্তু সাহিত্যের বাগানে যে ভাবের ফুলটি ফোটে তাহার সম্বন্ধে কি সেই একই প্রণালীতে তত্ত্বখবর লওয়া যায়? সে বাগানে যাহারা যায় তাহারা কি তত্ত্বের জন্য যায়, না আনন্দের জন্য যায়? অনেকগুলি দল যে একটি বাঁধনে ধরা দিয়া অখণ্ড একটি ফুল হইয়া উঠিয়াছে ইহাতেই তো আনন্দ, আবার যদি ছুরি ধরিয়া সেই অখণ্ডতাকে খণ্ড খণ্ড করা যায়, তবে আনন্দ থাকে কেমন করিয়া?

আমার মনে হয় যে ভাল কাব্য বা সাহিত্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এই-টুকু বলাই পর্য্যাপ্ত যে ইহা আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, বা ইহা পড়িয়া আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি। কবির সৃষ্টির যে আনন্দ তাহাই পুনরায় নিজের মধ্যে সৃজন করিয়া তোলা, ইহারই নাম সমালোচনা। কবি যে ফুল ফোটান সমালোচক ঠিক তারি পাশে তারি অনুরূপ আরেকটি ফুল ফোটান, ভাল সমালোচনা সেই জন্যই এক রকমের সৃষ্টি। কিন্তু হায়, তেমন সমালোচনার শক্তি কিম্বা সুযোগ কোথায়? ইচ্ছা থাকিলেও ঠিক মনের আনন্দটুকু জ্ঞাপন করিয়া এখন বিদায় লওয়া যায় না। তাহার কারণ,

কবির সঙ্গে পাঠকদের সঙ্গে এখন বোঝাপড়া নাই। কবির আসরে পাঠকেরা স্থান পান না,—কবি থাকেন, "hidden in the light of his thought"—আপনার চিন্তার আলোকে আপনি আবৃত। কাজেই বেচারা সমালোচককে মধ্যস্থের কাজ করিতে হয়। একবার কবির দরবারে, একবার পাঠকদের আড্ডায়, দুই জায়গায় ঘুরিয়া তাঁহাকে সংবাদ বহন করিয়া বেড়াইতে হয়। যদি লেখকে পাঠকে কোন ব্যবধান না থাকিত, তবে সমালোচকও আপনার কাজ সহজে করিতে পারিতেন! অনেক কথার জঞ্জাল জড়ো করিবার উপদ্রব তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত না।

'ডাকঘর' ও তাহার পুর্ব্ববর্ত্তী 'রাজা' যে ধরণের নাটক, এ ধরণের নাটক বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন। বলা বাহুল্য এ দুইটিই "হেঁয়ালী" শ্রেণীভুক্ত। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় "সোনার তরী" এবং "পরশপাথর" ধরণের কবিতা ছাড়া কবি আর এমন কিছুই লেখেন নাই যাহার জন্য তাঁহাকে লোকে দুর্ব্বোধ বলিয়া অপবাদ দিয়াছে। ঐ কবিতাগুলিই ঠিক্ কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থের মধ্যে ধরা দিতে নারাজ।

অথচ সেই পূর্ব্বের রূপকজাতীয় কবিতার সঙ্গে আর এখনকার এই নাটকগুলির সঙ্গে আমি ভারি একটি মিল এক জায়গায় দেখিতে পাই। আমার মনে হয় ইহাদের মূলভাব একই, কেবল রূপ স্বতন্ত্র। কতকগুলি রস যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা

নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু তাহাদের মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত ইমোশন্ অর্থাৎ হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত হয়, তাহা নহে। প্রেম, ভক্তি, করুণা, সৌন্দর্য্যবোধ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে তাহাদের ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায়, তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট হইবার নহে। কারণ, সেই বিশেষ অনুভূতিটাই কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা আরও কঠিন হইয়া বসে। তখন symbol অথবা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইসারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।

'সোনার তরী' মানেই কোন বিশেষ রূপ নয়, কিন্তু অপরূপ ? কালিদাস বলিয়াছেন যে, "রম্যাণি বীক্ষ্যমধুরাংশ্চ নিশম্য-শব্দান্" রম্য দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া মন যখন পর্য্যুৎসুক হয়,তখন জননান্তরসৌহৃদানি, জন্মজন্মান্তরের ভালবাসার কথা মনে পড়ে। এই যে একটি রস, ইহাকে কি নাম দিব ? উপলক্ষ্যটা হয়ত কোন বিশেষ রূপ বা বিশেষ ধ্বনি—কিন্তু তাহাকে ছাড়াইয়া মন যে উতলা হয়, সে এমন একটি অপরূপ সুদূরের জন্য, যাহার কোন নাম নাই, রূপ নাই। বর্ষার ভরা নদী হয়ত 'সোনার তরী'র উপলক্ষ্য, কিন্তু সে যে বিরহকে জাগায়, তাহা আর তাহাকে আশ্রয় করিয়া তো থাকে না।

কিন্তু কেনই বা symbol লইয়া এত বকাবকি করিতেছি ? আমাদের দেশে এটা তো অপরিচিত জিনিষ নহে। হিন্দুর

ধর্ম্ম,' কর্ম্ম, আচার, অনুষ্ঠান, শিল্প, সমস্তই ভাবের বিগ্রহে আগাগোড়া মণ্ডিত। হিন্দু তো একথা বলে না যে ভাবকে কোন দিন কেহ জানিয়া, ব্যবহার করিয়া, বলিয়া শেষ করিয়া দিতে পারে? সেই জন্যই তো সে চিহ্ন মানে, বিগ্রহ মানে—সে জানে যে, ভাব অসংখ্যরূপে আপনাকে ক্রমাগত লীলায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সেই সমস্ত রূপরূপান্তরকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করিয়াও বিরাজ করে। হিন্দুর চিত্ত কেন না বলিবে যে, 'সোনার তরী' বল, 'চিঠি' বল, 'পরশপাথর' বল, 'রাজা' বল, ও সমস্তই ছল ;—অনন্ত সৌন্দর্য্যের বোধকে একটি মূর্ত্তির মধ্যে ক্ষণকালের মত বাঁধিবার আয়োজন ;—ও যে ছল এইটুকু উহাকে দিয়া বলানোই উহার চরম সার্থকতা!

আসল কথা, অনন্তের রসবোধ যখন সাহিত্যের দরবারে আসিয়া রূপ প্রার্থনা করে, তখন সাহিত্যস্রষ্টাকে বিপদে পড়িতে হয়। তাহাকে পণ করিতে হয় কি করিয়া রূপ দিয়াও রূপ না দেওয়া যায়। কারণ রূপ যে সীমাবদ্ধ, সে এমন ভাবকে কি করিয়া প্রকাশ করিবে যাহা সীমায় ধরা দিবে না? তখন তাহার একমাত্র সম্বল হয় উপমা বা রূপক। উপমা খানিকটা বাঁধে, খানিকটা আল্‌গা রাখে। সে বাঁধন এতই সুকুমার, যে তাহার আবরণ সরাইয়া ভাবকে দেখা কিছুমাত্র কঠিন হয় না।

আশা করি, আমি কেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোন কবিতা এবং আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াছি, তাহা

পাঠকের নিকটে স্পষ্ট হইয়াছে। আমি বলিতে চাই এই যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপের ভিতরে অপরূপকে দেখিবার জন্য একটা বেদনা আছে বলিয়াই তাঁহাকে অপরূপের ভাবটিকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে যাহাতে সে নির্দ্দিষ্ট না হইয়া উঠে। অর্থাৎ তাঁহাকে symbol আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

Symbol লইয়া এত ব্যাখ্যাবাহুল্য করিবার আর একটু কারণ আছে। symbol এর ঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অনেকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, তবে সোনার তরীটা কি, তাহার উদ্দিষ্ট মানুষটি কে? সোনার ধানটা কি? অমল কি তবে মানবাত্মা? চিঠি মানে কি মুক্তি? অর্থাৎ তাঁহারা সমস্ত একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে চান্! আধ্যাত্মিক সত্যকে এই সকল লোকই বৈজ্ঞানিক সত্যের মত পরিষ্কার না দেখিতে পারিলে অধীর হইয়া উঠেন এবং ধর্ম্মকে কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে উদ্যত হন্। ইঁহারা একটা কথা মনে রাখেন না যে বুদ্ধির উপরেও মানুষের একটা Intuition—একটা সহজ প্রত্যয় আছে, বুদ্ধি যেখানে নাগাল পায় না, সেইখানে তাহার শরণাপন্ন হইতে হয়।

(২)

'ডাকঘর'কে symbol অর্থাৎ বিগ্রহরূপী নাট্য নামকরণ করা গেল। এটা ঠিক্ নাম নয়, কিন্তু নির্দ্দেশ মাত্র। এখন

দ্বিতীয় কথা এই যে ইহা নাটিকা বটে, অথচ ইহার মধ্যে নাটকত্ব কিছুই নাই। অর্থাৎ কোন গল্পও নাই, ঘটনাও বড় নাই। তবে ইহাকে সোনার তরী গোছের কবিতার মত করিয়া লিখিলেই হইত; নাটিকা বলিয়া আড়ম্বর করিবার কি প্রয়োজন ছিল।

একটি রুগ্ন বালকের সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কল্পনাপীড়িত চিত্ত বিশ্বের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল, শুধু এই ভাবটুকু যদি থাকিত তবে তাহা গীতে ব্যক্ত করা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু অমলের সঙ্গে সঙ্গে মাধব দত্ত, ঠাকুর্দ্দা, মোড়ল, সুধা প্রভৃতি যে মানুষগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে নানা বৈচিত্র্য আছে। কেহ বা অনুকুল কেহ বা প্রতিকূল। সুতরাং ঐ মূলভাবটুকুকে সূত্রের মত করিয়া এই সকল বৈচিত্র্যকে তাহার সম্মিলিত করিয়া একটি স্ফটিকব্যূহ রচনা করিতে হইয়াছে। এই বিচিত্রতার সমাবেশেই তো নাট্যরস। শুধু একটি মাত্র ভাবের রস হইলে গীতিকবিতার রূপ গ্রহণ করা উচিত ছিল। সুতরাং এ নাটিকার শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলে পূরা রসাস্বাদন হয় না, ইহা মাঝখানে পড়িয়া থামিবার জো নাই।

ঘটনার পর ঘটনা সাজাইলেই কি সব সময়ে ঔৎসুক্য বেশি করিয়া জাগে? আমার আমার তো মনে হয়, ভিতরের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতির একটা ক্রমবিকাশের গতিবেগ বাহিরের ঘটনপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশী প্রবল। যেমন

ধর 'গোরা' উপন্যাসটি। তাহার উপাখ্যান-অংশটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করা যায়। কিন্তু মানবহৃদয়ের কি বেগবান্ প্রচণ্ড ঘাতপ্রতিঘাত ঐ উপন্যাসে তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে—অধ্যায়ে অধ্যায়ে, এমন কি, ছাত্রে ছত্রে যে ঔৎসুক্য খাড়া হইয়া জাগিয়া থাকে—এমন কোন্ ঘটনাবহুল উপন্যাসে থাকে আমি তো জানি না।

এই নাটিকাটিতেও কবিজীবনের যে সকল নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে সকল সূক্ষ্ম অনুভাব নানা স্থানে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা পাঠ করিতে করিতে পদে পদে বিস্ময় অনুভব করিতে থাকিবেন। ঠিক যেন একটি অজানা দেশের মত। তাহার পথের প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক বাঁকে নব নব বিস্ময়—তাহা ছাড়া তাহার নানা গলিঘুঁজির তো কথাই নাই। সেই বিস্ময়ের আলোড়নেই সমস্ত নাটিকাটি সজীব হইয়া আছে।

(৩)

মাধব দত্ত সংসারী লোক, সে তাহার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো অমলকে পোষ্য লইয়াছে। ছেলেটি রুগ্ন,—শরতের রৌদ্র আর হাওয়া যাহাতে ছেলেটি না লাগায়, সে বিষয়ে কবিরাজ মাধব দত্তকে সতর্ক করিয়া গিয়াছে। অমলের মন বাহিরে যাইতে না পারিয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। সে তাহার বাড়ীর জানালার নিকটে বসিয়া থকে—দূরে পাহাড়ের নীচে

ঝরণা, ঝরণাতলায় ডুমুর গাছ—জানালার সাম্‌নেই রাজপথ, ফিরিওয়ালা সুর করিয়া ফিরি করে, রাজার প্রহরী মধ্যাহ্নের স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজায়। ঐ দূর পাহাড়, ঐ ঝরণা, ঐ ফিরিওয়ালার সুর, ঘণ্টার ঢং ঢং তাহাকে আন্‌মনা করিয়া দেয়—কোন্ সুদ্‌রের একটি ডাক তাহার বুকের মধ্যে বহন করিয়া আনে।

'জীবন-স্মৃতি' এবং 'ডাকঘর' প্রায় একই সময়ে বাহির হইয়াছে, সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারি না কি? সেই ফিরিওয়ালার ডাক, রাত্রে ঘণ্টার শব্দ, সেই কল্পনাভারাক্রান্ত মন—এতো কোনমতেই আমাদের অপরিচিত নয়?

'ক্ষণিকা'য় 'কবির বয়স' কবিতায় কবি তাঁহার কেশে পাক ধরিয়াছে শুনিয়া মহা রাগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি সকলের সঙ্গে একবয়সী।

প্রৌঢ় বয়সে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছেন,—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী!
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে!—

তাহার সুরের সঙ্গে বাল্যজীবন-স্মৃতির সুর মেলে এবং ডাক-ঘরেরও সুর মেলে! কবির বয়স যে চিরকাল সমানই থাকিয়া যায়, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যায় বটে!

বাস্তবিক এই সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটিই ডাকঘরের মূলভাব।

কবির মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে তিনি অনেক সময় এই পৃথিবীর পরিচিত দৃশ্য-শব্দ-গন্ধকে এমন ভাবে অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যেন এই পৃথিবীতে তিনি সদ্য আসিয়াছেন। এখানে সমস্তই যেন নূতন, কিছুই যেন তাঁহার পরিচিত নহে। এই যে নিকটতম, অভ্যস্ততম, পরিচিততম জিনিসকে বহুদূরের একটি বিরলব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ছাড়া দিয়া দেখা—ইহাতেই অভ্যাসের ও পরিচয়ের জড় আবরণ তাহার মুখের উপর হইতে সরিয়া যায়—সে আশ্চর্য্য স্থন্দর হইয়া উঠে।

এমন করিয়া দেখিলে সমস্তই রহস্যময়! দইওয়ালা যে রাস্তা দিয়া দই হাঁকিয়া চলিতেছে সে তো একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়, তাহার চারিদিকে কত দূরদূরান্তরের কত সৌন্দর্য্য ঘিরিয়া আছে, সেই পাচমুড়া পাহাড়ের তলার সৌন্দর্য্য, সেই শাম্‌লীনদীর সৌন্দর্য্য, সেখানকার সেই লাল মাটির রাস্তাটি, বড় বড় গাছের ছায়া, পাহাড়ের গায়ে যে গরু চরিতেছে তাহাদের সৌন্দর্য্য, সেই যে গোপবধূরা ডুরে সাড়ী পরিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদের সৌন্দর্য্য, সেই গ্রামের সমস্ত স্নেহ-প্রেমমাধুর্য্যের কত সৌন্দর্য্য—এই সব সেই দইওয়ালাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাইতো সে এমন রমণীয়! তাই তাহার ফিরির সুরটিকে বিশ্ববাঁশীর মত সকরুণ করিয়া দিয়াছে—বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোন মাহাত্ম্যই নাই।

তেমনি ঐ যে সম্মুখের পথটি, তাহারো রহস্য ঐখানে—সে যে বহুদূরের যাত্রীকে ক্ষণিকের মত চকিতের মত একবার ঐ একটি জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেখাইতেছে—বলিতেছে, অনন্ত-প্রবাহের একটিমাত্র পরিপূর্ণ মুহূর্ত্তের ছবিখানি দেখ! অনন্ত সমুদ্রকে একটিমাত্র তরঙ্গের মধ্যে দেখ—ইহার পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র—ইহার সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র—সেই সমস্ত প্রবাহ যেন এই একটি তরঙ্গে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে!

তার মানে কি? তার মানে এই যে আমরা এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি বা পাইতেছি তাহা ক্রমাগতই চলিবার মুখে, সরিবার মুখে। আমরা তাহার আদিও জানিনা, অন্তও জানিনা, জানি শুধু তাহার মাঝখানের খণ্ড একটুখানি কালের কথা। সেই খণ্ডকালে যেটুকু যাহা দেখিতেছি, তাহাকেই বাস্তব বলিয়া সত্য বলিয়া যে আমরা চাপিয়া ধরি, তাহাতেই তাহাকে হারাই, তাহার যথার্থ সত্তাকে পাই না। যদি সেই খণ্ডকালের খণ্ড জিনিসের উপর তাহার অনাদি অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের একটি আলো ফেলিয়া সেই খণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ডের পরিচয় পাই তবেই সেই জিনিস আশ্চর্য্য অপরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহা তখন একদিকে ব্যক্ত, অন্যদিকে অব্যক্ত, একদিকে সসীম অন্যদিকে অসীম, একদিকে রূপ, অন্যদিকে অপরূপ। তখন সে কি বিস্ময়—কে তাহা বর্ণনা করিবে?

এ তত্ত্বের কথা নয়, কিন্তু দৃষ্টির কথা। এই দৃষ্টি লইয়াই কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধি যে

মানুষের শেষ সম্বল নয়, তাহার সঙ্গে যে কেবল বহির্বিষয়মাত্রের যোগ, মানুষের অধ্যাত্মপ্রকৃতির গভীরতা পরিমাপ করিতে বুদ্ধি যে অক্ষম—এ সকল কথা আধুনিক যুগে ইউরোপের তত্ত্বজ্ঞানীদল স্বীকার করিতেছেন দেখিতে পাই। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ আঁরি ব্যার্গসঁ (Henri Bergson) বলেন, "আমাদের বুদ্ধি এবং বাহিরের বিষয় পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। (Creative Evolution, ১৯৭ পৃঃ) চৈতন্যকে যদি বুদ্ধির গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখ তবে তাহা বাহ্যবিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িবে।" সুতরাং বুদ্ধির দৃষ্টি খণ্ডিত দৃষ্টি—আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমগ্রতা তাহার নাই। কিন্তু যাঁহারা মানবচিন্তা যে কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা সকল বড় জিনিসকেই পরিহাস করিতে থাকিবেন। ইঁহাদেরি জন্য কি ম্যাথিউ আর্নল্ডকে 'ফিলিস্টাইন' কথাটা উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল?

(৪)

ডাকঘরের মূলভাব না হয় বুঝা গেল, কিন্তু 'ডাকঘর,' 'চিঠি,' 'রাজা' প্রভৃতি ব্যাপার কি? এই যে কল্পনাব্যাকুল সৌন্দর্য্যানুভূতিময় চিত্ত, ইহাকে রুগ্ন করিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবারই বা তাৎপর্য্য কি এবং রাজার চিঠির জন্য উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিবারই বা অর্থ কি?

আমরা যে রুগ্ন এবং বদ্ধ কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞসা করিবার কি প্রয়োজন আছে? আমরা বাহির হইতে চাই এ কথাটা যতখানি সত্য, ততখানি সত্য এই কথাটাও যে, আমাদের অন্তরে বাহিরে নানা বাধা জড়াইয়া আছে। বারবার কি আমাদের বদ্ধ ঘরে অভিসারের বাঁশীর ডাক আসে না? কিন্তু হায়, বাঁধন কি একটি, নিষেধ কি সামান্য?

মাধবদত্ত-কবিরাজরূপী সংসারতো আছেই, সুধাও আসিয়া যে আধখানা দরজা খোলা আছে তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে চায়।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি!

কিন্তু কল্পনা তো বাঁধ মানে না, সে যে পাখা মেলিয়া সর্ব্বত্র উড়িতে চায়! তার পণ সে সব দেখিবে, সব কিছুর আনন্দ সম্ভোগ করিবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তাহাকেও কুলায় ফিরিতে হয়। তখন বলিতে হয়ঃ—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি।—

খেয়া।

এইরূপে কবির জীবন যখন গিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে মিলিয়া যায়, তখন ঐ একটি মাত্র ইচ্ছা প্রাণ জুড়িয়া বাজে, যে তাঁর চিঠি

চাই,—তিনি কবে আসিবেন? সেইখানেই যে সমস্ত বিচিত্রতার অবসান, সেইখানেই সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি!

নাটিকার মধ্যে এই যে এক ভাব হইতে আর এক ভাবে গিয়া পড়িতেছি, (Progression thought) ইহাতেই তাহার মধ্যে একটি গতিসঞ্চার হইয়াছে। এখন আর পথের অনেকের সনে দেখা' নয়, এখন ঘরের মধ্যে চিঠির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা; এখন আর বহু বিচিত্রতাময় দিন নয়, এখন শীতল অন্ধকার-পূর্ণ রাত্রি!

নাটিকার পরিণামটা আমার স্পষ্টতই মৃত্যু বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠক মাত্রেই জানেন যে তিনি জীবনকে এবং মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন না তিনি মৃত্যুকে জীবনেরই পূর্ণতর পরিণাম বলিয়া মনে করেন। 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে এই ভাব, 'ঝরণাতলা' কবিতাটিতেও এই একই ভাব—যে, জীবনে যেটা ঝরণারূপে সাতপাহাড়ের সীমানার মধ্যে রহিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাহাই সেই সীমা অতিক্রম করিয়া নদী হইয়া বহিয়া গিয়াছে, মৃত্যু ছেদ নয়, সে পরিপূর্ণতা।

শুধু তাই নয়। পূর্ব্বের কোন কোন কবিতাতে কবি 'মৃত্যু-মাধুরীর' কথাও বলিয়াছেন।

> পরাণ কহিছে ধীরে, হে মৃত্যু মধুর
> এই নীলাম্বর একি তব অন্তঃপুর?—চৈতালী।

মৃত্যু যেন একটি পরিপূর্ণ সুদূর—সমস্তই তাহাতে বিলম্বিত হইয়া সীমা-আবরণ উন্মোচন করিয়া মধুর হইয়া উঠে। আমরা

একটু আগে ডাকঘরের যে মূল ভাবটীর কথা আলোচনা করিয়াছি, মৃত্যুকে এমন পরিপূর্ণ ও মাধুর্য্যময় করিয়া দেখিলে সে ভাব মৃত্যুর সঙ্গে দিব্য সঙ্গত হয়।

কারণ, কিছুই যে থাকিবে না, সেই জন্যই তো বাস্তবিক সমস্তই এমন সকরুণ, এমন সুন্দর। মৃত্যু আছে বলিয়াই জগতের কোথাও কোন ভার নাই। সমস্তই একটি সুদূরের ব্যক্ত বিষাদে বেদনার মত বাজিতেছে! সুতরাং এখানে মৃত্যু যদি পরিণাম হয়, তবে তাহাকে কোন মতেই খাপছাড়া বা আকস্মিক বলা চলে না। কবি যে বলিয়াছেন,—

> সে এলে সব আগল যাবে ছুটে
> সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে—

মৃত্যু একটি বন্ধনমোচনের আনন্দ হইয়া উঠিবে।

তবে কি রাজার চিঠির জন্য অমলের যে ব্যাকুলতা সে এই মৃত্যুর জন্য ব্যাকুলতা?

না। সে কথা বলিলে রাজার চিঠিকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখা হইবে।

রাজা যে অমলের মত ছোট মানুষের কাছে আসিতে পারেন এই কথাই তো মোড়ল জাতীয় লোক বিশ্বাস করে না—তাহারা জানে যে তিনি রাজা—তিনি কেবল বড় বড় মানুষকেই দেখা দেন্। কিন্তু তাঁহার যে একটি আনন্দ ঐ ছোট বালকের উপরেও অনন্ত হইয়া আছে, উহার নামে যে তিনি কোন্ অনাদিকাল হইতে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, কতবার যে সেই

লিপির আহ্বান কত প্রভাতে সন্ধ্যায় বহিয়া গিয়াছে,—তাহা কি মোড়ল জাতীয় বুদ্ধিজীবী অবিশ্বাসীরা জানে? না, মাধবদত্তের মত ঘোর সংসারীরা জানে? একমাত্র লোক যে সেই বার্ত্তা জানে সে ঠাকুর্দ্দা।

'শারদোৎসব' নাটকের সময় হইতেই এই ঠাকুর্দ্দাকে কবির প্রয়োজন হইয়াছে। এই একটি মুক্তপ্রাণ মানুষ—যে সকলের সঙ্গে সব হইয়া আছে, পরিপূর্ণ আনন্দকে জানে—ইঁহাকে নহিলে কবির কল্পনাগুলি সমর্থন পাইবে কেমন করিয়া? সোনার তরী, ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, হাল্কা দেশ প্রভৃতি ব্যাপার যে সত্য সত্যই আছে—সে কথার সাক্ষ্য ঠাকুর্দ্দা ভিন্ন দিবে কে? ফিলিষ্টাইন্ দলকে শাসাইয়া সংযত করিয়াই বা রাখিবে কে?

ঠাকুর্দ্দা বলিতেছেন,—"শুনেছি ত তাঁর চিঠি রওনা হ'য়ে বেরিয়েছে।"

কিন্তু কবে?

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে?

অমল উত্তর করিতেছে—"তা আমি জানিনে। আমি যেন চোখের সাম্‌নে দেখতে পাই মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেচি—সে অনেক দিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্চি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলি নেমে আসচে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধ'রে সে

কেবলি নেমে আস্‌চে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে, সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধ'রে সে কেবলি চলে আস্‌চে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত; তারি সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলি আস্‌চে—তার পর আখের ক্ষেত—সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চ'লে গিয়েছে সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চ'লে আস্‌চে—রাতদিন একলাটি চ'লে আস্‌চে; * * * যতই সে আস্‌চে দেখচি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুসি হ'য়ে হ'য়ে উঠ্‌চে।"

সুতরাং এ চিঠি কখনই সে চিঠি নয়, যে অমুক দিন অমুক সময়ে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। এ চিঠি যে আমি তোমাকে বড় আদর করিয়া আমার এই আহ্বান লিপি পাঠাইলাম। তুমি আমার, তোমাতে আমার আনন্দ আছে।

আমি এই জায়গায় আমার পাঠকদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠি' নামক কবিতাটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। সে চিঠিখানিও বিশ্বচিঠি, তাহার লিখন কবি জানেন না, কে লিখিয়াছে তাহাও জানেন না—কিন্তু পাইয়াছেন এই সুখেই তিনি খুসি, তাঁহার বুকের ভিতরটা আনন্দিত হইয়া উঠিতেছে।

অমল তাই ঠাকুর্দ্দাকে বলিতেছে যে প্রথমে যখন তাহাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার মন ছট্‌ফট করিতেছিল, এখন ডাকঘর দেখিয়া অবধি প্রত্যহই তাহার ভাল লাগে, "ঘরের মধ্যে ভাল লাগে।" "একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছিবে সে কথা মনে কর্‌লেই আমি খুসি হ'য়ে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পারি।"

(৫)

এইবার পরিণামে আসা গিয়াছে। চিঠি পাইবার ভরসার পর পরিণাম সত্যই পরিণাম, পরিণাম পরিপূর্ণতা।

প্রথমে আমরা বিশ্বে বাহির হইবার ব্যাকুলতা দেখিলাম, তারপর রাজার চিঠির প্রত্যাশায় ঘরে চুপ করিয়া থকিতেও ভাল লাগে দেখিলাম।

এখন দেখি * * "চোখের উপর থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আস্চে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করচে না। রাজার চিঠি কি আস্বে না?"

বোধ হয় জগতের কোন কবিই মৃত্যুকে জীবনের বর বলিয়া কল্পনা করেন নাই—জীবনে মৃত্যুতে যে বিবাহের অতি নিবিড় সম্বন্ধ সে কথা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মাঝের বয়সের কবিতায় জীবন ছিল বালিকাবধূ, তখন তাহার বরকে ভয় করিত—'প্রতীক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় তাই তিনি আরও কিছু দিনের মত খেলাধূলার ঘরের মধ্যে বাস করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সের কবিতায় ক্রমাগতই তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

ওগো আমার এই জীবনের শেষ
পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও
আমারে কথা।

সুতরাং রাজদূতকে তিনি যদি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে উপস্থিত করেন, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই !

তবু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংশয় যায় না। বাহির হইতে মোড়লের অবিশ্বাসের পরিহাসের খোঁচাও আছে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে সত্যকেই অবিশ্বাস করে কিনা, সে হাঁ কেই না বলিতে চায় কিনা, তাই তাহার অবিশ্বাসই তাহার বিশ্বাসকে যথার্থরূপে পাইবার উপায় হইয়া দাঁড়ায়। সত্যকে সে যত আঘাত করে, ততই তাহার নিজের অবিশ্বাসের প্রাচীর একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া যায়, শেষে সে দেখে যে সে পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য সত্যই ঘটে। সে জানেনা যে, অক্ষরশূন্য কাগজেই রাজার চিঠি আসে। কারণ তাঁহার চিঠির তো বাহ্যিক কোন নিদর্শন নাই, সে চিঠি আমাদের আশা এবং নির্ভরের ভিতরে আসিয়া যে পৌঁছায়। মুড়িমুড়কি খাইতেও তিনি সামান্য লোকের ঘরেই আসেন—কারণ, তাঁহার আসা যে নিঃশব্দ গোপন—তিনি তো আগেভাগে জানাইয়া কাহাকেও দেখা দেন্‌না। সে একেবারেই আচমকা হঠাৎ আবির্ভাব, তাহার জন্য কেহই কখনই প্রস্তুত থাকে না।

মোড়লের পরিহাসের মধ্যে ঠাকুর্দ্দা এই সত্যটিকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি অমলকে ইহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতেই দিলেন না। রাজার চিঠি আসিয়াছে! রাজাই স্বয়ং আসিতেছেন! হাঁ এই কথাই সত্য!

তার পর রাজদূতের প্রবেশ এবং রাজ-কবিরাজের আগমন।

দ্বার ভাঙিয়া গেল, প্রদীপ নিভিয়া গেল, ঘরের সমস্ত দুরজা জানালা এক নিমেষে খুলিয়া গেল! অৰ্দ্ধরাত্রে রাজা আসিবেন শুনা গেল। অমল স্থির করিল যে সে তাঁহার ডাকহরকরার কাজটি প্রার্থনা করিবে। বাস্তবিক কবি কি সেই কাজই করেন না? শূন্য কাগজে অক্ষর পড়িয়া দেওয়াই তো তাঁহার প্রধান কাজ!

নাটিকা সমাপ্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথের এইখানেই আশ্চর্য্য কৃতিত্ব যে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবননাট্যের নানা অঙ্কের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন সরল একটি সূত্রের মধ্যে ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা, সৌন্দর্য্যব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক বেদনা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, অপেক্ষা, শান্তি সমস্তই এই নাটিকায় কোথাও হয়ত একটি ছত্রে বা আধখানি পংক্তিতে তিনি ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছেন,—কোথাও বা সোজা পথ ছাড়িয়া গলিতে ঘুঁজিতে এমন সব রহস্য ছড়াইয়াছেন যে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যেমন সুধার কথা। সে অমলের আধখানা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল;—তাহার সেই ক্ষণিক মোহটুকু সে অমলের মৃত্যুর পরেও রাখিয়া গেল,—সে বলিল-"ও যখন জাগ্‌বে তখন বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি।" এই এতটুকুর মধ্যে সমস্ত নারীপ্রকৃতির একটি রহস্য কবি কৌশলে ছুঁইয়া গিয়াছেন। শেষ ক'টি কথা ব্রাউনিংএর Evelyn Hopeএর শেষ ছত্রগুলি মনে করাইয়া দেয়;—মৃত Evelyn

এর প্রণয়ী বলিতেছে—"এই একটি পল্লব আমি তোমার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলাম, ঘুমাও, যখন জাগিবে তখন তোমার মনে পড়িবে, তখন সব বুঝিতে পারিবে!"

এমন ইঙ্গিত কতই আছে।

ইউরোপেও বিগ্রহরূপী (Symbolical) নাটকের যুগ সুরু হইয়াছে। স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাটি মেটারলিঙ্কের নাট্যগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। লরেন্স এল্‌মাটেডেমা প্রভৃতি মেটারলিঙ্কের সমালোচকবর্গ তাঁহার নাটকের মধ্যে প্রাচীন ধর্ম্মের জীর্ণ ভিত্তির উপর নূতন অধ্যাত্মবোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কি সে চেষ্টা নাই? তিনিও আমাদের দেশের পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম দৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল, তেমন বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেই জন্য আমাদের দেশ ভেককে বিশ্বাস করে, বাস্তবকে করে না—স্বাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধকে কোন গোপন পন্থায় হারাইতে না দিয়া তাহাকেই বিশ্বের দিকে ব্যাপ্ত করিবার—সত্য করিবার জন্য কি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি একান্ত প্রয়াস নাই?

জীবনস্মৃতি

ভালো আত্মজীবনীর বিশেষত্বই এই যে তাহা জীবনকে কেবল বাহিরের কতকগুলি ঘটনার জড়সমষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলিত কয়েদীর মত করিয়া দেখায় না। তাহা জীবনের অন্তরতম স্থানের একটি গভীর অভিপ্রায়ের সূত্রে বাহিরের ঘটনাগুলিকে এম্‌নি মালার মতন গাঁথিয়া তোলে, যে, জীবনের সকল বৈচিত্র্যেরই একটি বড় তাৎপর্য্য দীপ্যমান হইয়া উঠে। জীবন যে বাহির হইতে কেবলি নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত, সে যে বদ্ধ নয়, কিন্তু মুক্ত—একথা আমরা তখন সহজেই বুঝিতে পারি।

কিন্তু এমন করিয়া আপনাকে উদ্ঘাটিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, নিজের কথা বলিতে গেলেই মানুষ অতি সচেতন হইয়া পড়ে—তখন তাহার কথার মধ্যে স্বচ্ছতা থাকে না,

দেখিতে দেখিতে মিথ্যা ও ভাণ আসিয়া দেখা দেয়। আপনাকে না ভুলিতে পারিলে, আপনাকে অন্য লোকের মত করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া না দেখিতে পারিলে, আত্মজীবনী লিখিতে পারা যায়, ইহা আমার বিশ্বাস নহে। কিন্তু সেই আপনাকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র করা সকলের চেয়ে কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। এইজন্য সাহিত্যে যথার্থ আত্মজীবনী লেখা সকলের চেয়ে শক্ত ব্যাপার। এখানে পদে পদে অহমিকা ও আত্মপ্রতারণার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ইহা এত দুরূহ।

ইউরোপে বহুদিন হইতে অনেকে এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। সেই জন্য দেখা যায়, যে, মানুষ সেখানে আপনাকে অনেকটা পরিমাণে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সেণ্ট্ অগষ্টিনের কন্‌ফেসন্‌সে যে সকল পাপের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের কোন সাধু মহাত্মা অমন অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কবি গ্যয়টে তাঁহার আত্মজীবনী যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের কোন কবির দ্বারা সম্ভাবনীয় বলিয়া মনে করি না। তাহার কারণ, মানুষের জীবন যে একটা অভিব্যক্তির লীলাক্ষেত্র, সেই কথাটা আমাদের চেতনায় যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই।

কবি রবীন্দ্রনাথ যে "জীবনস্মৃতি" লিখিয়াছেন, তাহার নামেই পরিচয় যে তাহা আত্মজীবনী নহে। বাল্য জীবনস্মৃতিই এই গ্রন্থের চারি ভাগের তিন ভাগ স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। অর্থাৎ

জীবনের কথা যতদূর পর্য্যন্ত অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে বলা যায় ততদূর পর্য্যন্ত কবি অগ্রসর হইয়াছেন, তারপর শক্তির অভাবের দোহাই দিয়া বিদায় লইয়াছেন। আপনার কথা নিতান্ত সহজে আত্মবিস্মৃত ভাবে বলা যে কত কঠিন তাহা কবি নিশ্চয় ভালরূপেই জানেন। এই গ্রন্থের মধ্যেও তাহার প্রমাণ যে মধ্যে মধ্যে পাই নাই এমন কথাই বা কি করিয়া বলি। যেখানেই তাঁহার নিজের রচনার কথা আসিয়াছে, সেখানেই কবি পরিহাসের পর্দ্দার আড়ালে সরিয়া গিয়াছেন—বেচারা রচনা বাহিরের লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির মধ্যে মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শিশুর মত অসহায় ও সকরুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৯৯ পৃঃ ভানুসিংহের কবিতা—১০৭ পৃঃ কবি কাহিনী—১২৭ পৃঃ ভগ্নহৃদয়—১৫০ পৃঃ সন্ধ্যাসঙ্গীত—১৫৩ পৃঃ ছবি ও গান দেখিলেই একথার সত্যতা বুঝা যাইবে। এই সমালোচনাগুলি যে অসঙ্গত বা অন্যায় হইয়াছে তাহা বলিতেছি না। কারণ এ সমস্ত রচনাই এত কাঁচা বয়সের যে, সে সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন, নিরপেক্ষ সমালোচক হয় ত তদপেক্ষা তীব্রতর ভাবে লিখিতে পারিত। কিন্তু কবির যে একটি সসঙ্কোচ কৌতুকলীলা ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই বেশ বুঝা যায় যে ঐটি তাঁহার প্রকৃতিগত—তিনি যদি আরও অগ্রসর হইতেন তবে পরিণত বয়সের রচনাগুলিরও অবস্থা অতদূর শোচনীয় না হোক, খুব আরামের হইত না বোধ হয়।

কিন্তু যাহা পাই নাই তাহার জন্য আক্ষেপ থাকিলেও সে

আক্ষেপ বৃথা। কবির 'জীবনস্মৃতিতে' জীবনচরিতের স্বাদ না পাইলেও একটি জিনিস ইহার ভিতরে পাওয়া গিয়াছে, যাহা যে কোনও ভাষায় অতুলনীয়। কবি গ্রন্থের আরম্ভে বলিয়াছেন যে, স্মৃতির পটে জীবনের যে ছবি অঙ্কিত হয় তাহা ইতিহাস নয়, অর্থাৎ যাহা বাহিরে ঘটিয়াছে তাহার যথাযথ নকল নয়। তাহা "এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।" জীবনের সেই নানা বিচিত্র স্মৃতিচিত্রের আনন্দরসে এই গ্রন্থখানি ভরপূর। সেইজন্য ইহা এমন আশ্চর্য্য। মানুষের জীবনের সকল প্রকারের স্মৃতির মধ্যে যে এমন অপূর্ব্ব একটি চিত্ররস থাকিতে পারে, এই গ্রন্থ না পড়িলে তাহা মনে করাই সম্ভব হইত না।

আমি দেখিয়াছি সাহিত্যে অধিক কথার ভার চিত্ররসের পক্ষে ব্যাঘাতকর। নির্ম্মল জলেই যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ চিন্তার গুরুভারকে সরাইতে না পারিলে লেখা নানাচিত্রে প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র রাগে রঞ্জিত হইবার মত স্বচ্ছতা লাভ করে না। কবির অনেক বড় বড় কাব্যে তিনি অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন—কিন্তু 'ক্ষণিকা'য় কোন বড় কথা বলিবার ছিলনা বলিয়া, "শুধু অকারণ পুলকে" ক্ষণিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিপূর্ণ আনন্দে ডুব দিবার আয়োজন ছিল বলিয়া তাহা বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতির অমন সুন্দর চিত্রমালা হইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক ক্ষণিকায়—

> শত বরণের ভাবউচ্ছাস
> কলাপের মত করেছে বিকাশ

রঙের এমন ছড়াছড়ি, ছন্দের এমন নৃত্যলীলা—কোনো কাব্যে কি কখনো দেখা গিয়াছে ?

এবারেও জীবনচরিত লিখিবেন না বলিয়াই কবি জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছিলেন। তাই শুধু নিজের বাল্য জীবনের চিত্র নয়,—বাড়ীর চিত্র, পরিবার মণ্ডলীর চিত্র, তৎকালীন সমাজের চিত্র, নানা লোকচিত্র, ও প্রকৃতির দৃশ্যচিত্রে গ্রন্থখানি পূর্ণ করিয়া আমাদের হাতে আনিয়া দিয়াছেন।

এই স্মৃতিচিত্রে যে রং পড়ে, সে এমন একটি মোহমাখানো কল্পনার রং, যে আমার বিশ্বাস, কবি যদি চিত্রশিল্পী হইতেন তবে শুদ্ধমাত্র শব্দে সেই রং লাগাইয়া তিনি তৃপ্তিবোধ করিতেন না। কিন্তু চিত্র আঁকা তাহার আসেনা বলিয়া, ভাষাতেই চিত্রবিলাসকে মিটাইতে হয়। তথাপি নিপুণ শিল্পীর তুলিতে এই স্মৃতিচিত্র-গুলি কি আকার ধারণ করিতে পারে তাহা শুধু কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষরূপে দেখিবার সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছে। এই গ্রন্থে কবির সরস হাতের ভাষার চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্রযুক্ত হইয়া মণির সঙ্গে কাঞ্চনের যোগের মত অপূর্ব্ব শোভা খুলিয়াছে। আমরা তো চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; তথাপি গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বর্ণনার যে একটি মোহরস ? কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়াছে—দেখিতেছি সেই মোহের স্বপ্নাঞ্জন তুলিকায় মাখাইয়া অনতিস্ফুট বিভাসে শিল্পী তাঁহার প্রত্যেকটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সকল চিত্রগুলিই আমাদের ভাল লাগিয়াছে—তবে কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে

শুধু ভাল লাগিয়াছে বলিলে অত্যন্ত অল্প করিয়া বলা হয়। প্রথমতঃ বাড়ীর ভিতরের সেই বাগানের চিত্রটি যাহা তরুণ বালকের নিকটে 'স্বর্গের বাগান' ছিল। সেখানে বেশি গাছপালা ছিল না—একটা বাঁধানো চাতাল মাত্র ছিল—কিন্তু দুইটি নবীন চক্ষুর নিকটে তাহাই পর্য্যাপ্ত ছিল। অঙ্কিত ছবিটিতে সেই অল্পের মধ্যে যে একটি ভরপূর বিস্ময় ও আনন্দ—একটি নিত্য জাগ্রত কৌতূহল—তাহা অস্পষ্ট ছায়াভাসে এমন স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে। তারপর সেই রাত্রে বারান্দায় বসিয়া দাসীদের সলিতা পাকান ও বিশ্রম্ভালাপের চিত্র। একটুখানি অংশে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে, বারান্দার অবশিষ্ট অংশে তাহারা বসিয়াছে। চিত্রটি রাত্রির রহস্যে কি পরিপূর্ণ! জ্যোৎস্নালোক রাত্রির সকল আবরণ উন্মোচন করিতে পারে নাই—যে রহস্য-ভবনের ভিতরে কতকালের কত রূপকথা, কত স্বপ্ন, কত দূর দূরান্তরের কলগুঞ্জন নিবিড় হইয়া আছে, তাহারি একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না উঁকি মারিতেছে। আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি!—তারপর, সম্পূর্ণরূপে আইডিয়াল চিত্র যেগুলি, সেগুলিই বা কি চমৎকার! যেমন 'হেলাফেলা সারাবেলা একি খেলা আপনি সনে' এই গানটির চিত্র। দুপুর বেলার আলস্য-জড়ানো যে একটি ঔদাস্য আছে, বহু দূরের স্বপ্ন যখন মনকে উতলা করিয়া তোলে,—ঐ গানটিতে সেই উদাস ব্যাকুলতার একটি সুর আছে। গানটির কথার মধ্যে সেই সুরটিকে ধরা যায়

কিন্তু গানটি দুপুরে গুণ গুণ করিয়া কেহ গাইলেই তৎক্ষণাৎ মন তাহার অনুরণনে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। এমন একটি সুরকে রূপে ধ্যান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই ছবিটি তাই কল্পছবি—মানসবনের লীলাপুষ্পের গন্ধখচিত ছায়াছবি। সকল ছবিই এমনি অপরূপ—তাহাদের পরিচয় দিতে যাওয়া বৃথা—তাহারা নিবিষ্টভাবে উপভোগের জিনিস। যেগুলি মানুষের চিত্র, যেমন শ্রীকণ্ঠসিংহের—তাহাদের ভিতরেও অন্তরের প্রতিকৃতিটি কেমন সহজেই উঠিয়া আসিয়াছে। বাস্তবিক এই চিত্রগুলি এ গ্রন্থের বহুমূল্য অলঙ্কার।

আমি বলিয়াছি যে "জীবনস্মৃতি"তে কবির বাল্যস্মৃতি গ্রন্থের চারিভাগের তিনভাগ স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক বয়স্ক পাঠক ইহাতে মনে মনে আপত্তি করিতে পারেন যে ছেলে বয়সের কথার মধ্যে এত কি লিখিবার থাকিতে পারে? বৃন্দাবনের গোষ্ঠলীলায় ভগবান বালকবেশে সখাদের সঙ্গে খেলা করেন বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার বর্ণনা আছে। তার মানে ভগবান শিশুর সঙ্গে শিশু হইয়াই খেলা করেন—তাহার এত বড় বিপুল জগৎ একটি শিশুর খেলাঘর ব্যতীত কিছুই নয়। সকল মানবের শৈশবের আনন্দলীলাকে যদি সে অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেখায় এদেশের সত্য হইয়া থাকে এবং আমাদের হৃদয়ে তাহাকে সেই রূপেই যদি উপলব্ধি করিয়া থাকে—তবে কবির বাল্যজীবনের মাধুর্য্যময় চিত্ররস আমাদের উপভোগ্য হইবে না কেন? বুড়া বয়সে কবি

নিজে যে সেই বাল্যের স্মৃতিগুলি আঁকিতেছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার নিজের কি একটি নিগূঢ় উপভোগ নাই? সেই তাঁহার 'সুকুমার আমি'টিকে তিনি কি করুণ, কি সুন্দর করিয়াই দেখিতেছেন। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার বাল্যজীবন কিছুমাত্র সুখকর ছিল না। 'ভৃত্য-রাজকতন্ত্রে'র শাসনে কত ক্লেশ ছিল, তখন বাড়ীর বাহিরেও তাহার অবাধ গতিবিধি নাই, ভিতরেও। কিন্তু সেই সুকুমার কিশোরটিকে সেই সকল ক্লেশে কি কিছুমাত্র ম্লান করিয়াছিল? সেই বাড়ীর ধারের বাগান, পুকুর ও বটগাছ দেখিয়াই কত দিন তাঁহার আনন্দে কাটিয়াছে। মধ্যাহ্ন আকাশের খরদীপ্তি ও তাহার স্তব্ধতার মধ্যে চীলের তীক্ষ্ণকণ্ঠ ও ফেরিওয়ালার করুণ হাঁক কি উন্মনা করিয়া দিয়াছে। সেই নারিকেল তরুশ্রেণী, লেবুগাছ ও অন্যান্য দু একটা তরুবিশিষ্ট বাড়ীর ভিতরের বাগানটিই মানবের আদিম স্বর্গকাননের মত ছিল, শরতের শিশিরস্নাত সোনালি প্রত্যূষে সেইখানেই কত আনন্দে কত বিস্ময়ে হৃদয় কম্পিত হইয়াছে। এইতো শৈশব-লীলা—ইহা বৈষ্ণবী গোষ্ঠলীলার ন্যায় কিছু মাত্র ভাবগত জিনিষ (idealised) নয়—কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব হইয়াও চিত্ররসের মোহের জন্য ইহাকে পড়িতে কি অপরূপ কাব্যের মত বোধ হয়। এ কাব্য বাল্যজীবনের কাব্য।

আমার বিশ্বাস, পরিণত বয়সে কবি যে তাঁহার অপূর্ব্ব "শিশু" কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন, সেও এই স্মৃতি অবলম্বনেই। জীবন-স্মৃতির এই গোড়াকার অংশের সঙ্গে তাহার খুবই সাদৃশ্য

আছে, তবে কবিতা বলিয়া তাহা খুঁটিনাটি বর্ণনা-বর্জ্জিত। অথচ সেই খুঁটিনাটির জন্যই এই গ্রন্থে চিত্রগুলি এমন ভরাট্ হইয়াছে। "শিশু" কাব্যটি শিশুদের জন্য রচিত হইয়াছে এই ধারণায় অনেক বয়স্ক পাঠক তাহা পড়েন না জানি। তাহাদেরও দোষ নাই—বড় বড় হরপে বালকদিগের পাঠের সুবিধার্থে কাব্যটি মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশকের আড়ালে এখানে আমরা পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি যে কাব্যটির পূরা রস বুড়া শিশুরাই ভালরূপে আদায় করিতে পারিবেন। 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া পড়িলে চিত্র ও কাব্য উভয়েরই রস একই কালে পাওয়া যাইবে।

তারপর, ইস্কুল নামক কলের মধ্যে পৃথিবীর কোন বড় কবিই তৈরি হন্ না, সুতরাং কবির ছাত্রজীবনের কাহিনীতে বিশেষ উপভোগ্য কিছুই নাই কিন্তু এই বাল্যকালের পঠদ্দশার বিবরণের মধ্যে দুইটি চমৎকার চিত্র আমরা পাইয়াছি। একটি বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠসিংহের চিত্র। অন্যটি কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। এই চিত্র দুইটি কবির জীবনের ভাবের এবং কল্পনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিলে অসঙ্গত হয় না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভিতরকার যোগ আছে—সেই জন্য ইহারা কবির কল্পনাকে কেবল স্পর্শ মাত্র করিয়া বিদায় লয় নাই, খুব গভীর ভাবে আঘাত করিয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগের সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশের সম্বন্ধের মত, এই দুইটি চিত্রের পরস্পরের সম্বন্ধ। একটি চঞ্চল, অপরটি স্তব্ধ; একটি আত্মবিহ্বল

অপরটি আত্মসমাহিত ; একটি লীলাময়, অপরটি যোগমগ্ন ; একটি সজন, অপরটি নির্জ্জন। পূর্ণতার এই দুইটি দিকই কবির কাছে তুল্য আদরণীয়। অল্পবয়সের রচনায় পরিণত বয়সের চিত্র আঁকিবার বেলায় ইহাদের একটি দিকই পুনঃ পুনঃ দেখা দিত—ঐ আনন্দবিহ্বল উদার উন্মুক্ত রসোচ্ছ্বসিত দিক্। বৌঠাকুরাণীর হাটের বসন্ত রায় যেমন। কিন্তু অধিক বয়সের রচনায় 'রাজা' প্রভৃতি নাট্যের ঠাকুরদাদার চিত্রে ঐ দুইটি দিকের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়—পূর্ণতা ও পরিণতির ঐ যেন স্বরূপ।

এই একটি কারণ ব্যতীত মহর্ষির যে চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা অন্যান্য কারণের জন্যও ভালো করিয়া প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা কিছু-না-কিছু কৌতুহলী। তারপর তাহার পুত্রগণের উপর তাঁহার চরিত্রের ও আদর্শের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কতটা পড়িয়াছিল তাহাও জানিবার বিষয়। কিন্তু সকলের চেয়ে একটি কারণে এই চিত্রটি আমার মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হয় - তাহারি কথা বলিতেছি।

গ্রন্থ হইতে আমরা যে শিক্ষালাভ করি, তদপেক্ষা অনেক বেশি শিক্ষা যে মানুষের সঙ্গ হইতে লাভ করি,—বোধ হয় এ কথাটা মহর্ষি খুব ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য দেখিতে পাই যে তাঁহার বাড়ীটিকে তিনি সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা ও অনুশীলনের একটি আদর্শভূত প্রশস্ত ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রকারের গুণী ব্যক্তিদিগের সেখানে সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা ধর্ম্মপ্রাণ, কেহ বা গায়ক, কেহ বা রসজ্ঞ, কেহ বা সাহিত্যিক, কেহ বা দার্শনিক—কিন্তু সকলেই মহর্ষির নিকটে সম্মান ও সমাদর লাভ করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। নিজের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এই প্রকারের একটা বড় আব্‌হাওয়া সৃষ্টি হওয়ায়, তাহার শিক্ষাই কবি ও তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃগণের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষিগণ মহর্ষির বাড়িতে আপনার লোকের ন্যায় স্থান পাইয়াছিলেন। কবি বাল্যবয়সে বিহারীলাল, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতিকেই অবশ্য অধিক দেখিয়াছিলেন। আমার মনে হয় এই কারণেই সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের একটা সহজ বোধ এবং অনায়াস অধিকার মহর্ষি-পরিবারের একটা বিশেষত্ব হইতে পাইয়াছে। কোন কালেজী শিক্ষায় তাহা কদাচ হইতে পারিত না।

এইরূপে বাড়ির মধ্যেই শিক্ষার বীজ প্রচুররূপে ছড়ান হইয়াছিল বলিয়া, এই অনুকূল পরিবেষ্টনের মধ্যে কবির কাব্য-জীবনটি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল। কবি এই গ্রন্থের অনেক স্থানেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন :—"ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের আবহাওয়া বহিত। * * * বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক্ দিয়া উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্ম্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মধ্যে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। * * * বাড়িতে কতই আনাগোনা * * হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত।” সুতরাং বাহিব হইতে ও ভিতর হইতে কি কি কারণ একত্র হইয়া কবির চিত্তের বিকাশের পক্ষে সহায়তা করিতেছিল এই গ্রন্থ হইতে তাহার ইতিহাসের নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। সর্ব্বদা বিচিত্র প্রকারের সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা শ্রবণ, গীতচর্চ্চা, নানালোকের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের যে সুযোগ কবি লাভ করিয়াছিলেন, এমন পৃথিবীর কয়জন কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে জানি না। এই বাড়ীর শিক্ষাই তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা। পৃথিবীতে অনেক স্থানে একাডেমী বা অন্য কোন প্রকার সঙ্ঘ বা সঙ্গত হইতে অনেক ভালো জিনিষ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কেবল এবল একটা পরিবার হইতে ধর্ম্মে কর্ম্মে সাহিত্যে চিত্রে সঙ্গীতে দর্শনে স্বাদেশিকতায়, সর্ব্ববিষয়ে এত বিচিত্র এবং আশ্চর্য্য উৎকর্ষ ও সফলতা বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় নাই। কিন্তু ইহা সেই মহাপুরুষের জন্য—যিনি দেশের সকল শক্তিকে এমন সহজে আপনার চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

অথচ একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কবির জীবন তাঁহার নিজের ভিতর হইতেই একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ—বাহির তাহাকে অল্পই সাহায্য করিয়াছে। সারাল জমিতে বৃক্ষের বাড়িবার পক্ষে

সুবিধা হয় বটে, কিন্তু আপনার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির দ্বারাই সে বড় হইয়া উঠে। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে বলিয়াছেন যে "genius is the introduction of a new element in the intellectual universe"—প্রতিভা ভাবজগতে একটি নূতন বস্তুর ন্যায় আবির্ভূত হয়—তাহার দ্বারা ভাবজগৎ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে – রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে কথা খুবই সত্য। দুঃখের বিষয় যেখান হইতে সেই 'new element' নূতন বস্তুত্বের সূত্রপাত, সেইখানেই তাঁহার গ্রন্থের সূত্রও কবি ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার যৌবনবয়সের রচনা 'ভগ্নহৃদয়ের' প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার কালের ভাবজগৎ সম্বন্ধে একটুখানি আলোচনা করিয়াছেন—তাহা অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ একটি চিত্র হইয়াছে। (১২৭ পৃঃ হইতে ১৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কবি বলিতেছেন, তখনকার দিনে ইংরাজী সাহিত্য খাদ্যের পরিবর্ত্তে মাদক জোগাইয়াছিল। হৃদয়াবেগের যে প্রবলতা ইংরাজী সাহিত্যে পাওয়া যাইত, তাহার উদ্দীপনা ও মত্ততাকেই সাহিত্যরস ভোগ বলিয়া সেই সময়ে কল্পনা করা হইত! ইউরোপে সাহিত্যের হৃদয়াবেগের উদ্দামতা সেখানকার ইতিহাস হইতে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল—আমাদের দেশে সেই ইতিহাস পশ্চাতে না থাকায় উদ্দাম ভাবোচ্ছ্বাস অত্যন্ত অবাস্তব ও অসংযত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেকালের একদিকে নাস্তিকতা, অন্যদিকে প্রতিমাপূজার ভাবরসসম্ভোগ, উভয়েরই বাস্তববিচ্ছিন্ন ভাবুকতাকে কবি বেশ চমৎকার করিয়াই দেখাইয়াছেন।

'এই বস্তুশূন্যতা ও অসুস্থ ভাবুকতা যে কবির রচনাকে প্রথমে অধিকার করিয়া বসিবে তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার 'new element,' নূতন সৃজনী শক্তি সে অবস্থাকে কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল। জীবনস্মৃতি পাঠ করিয়া আমরা জানি যে সেই হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের একটি দ্বার কবির নিকট আবাল্যই উন্মুক্ত ছিল। সে দরজাটি বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য। কবে একদিন হৃদয়ারণ্যের গহন জটিলতায় পথ হারাইয়া সেই দ্বার খুলিতেই কেমন করিয়া অকস্মাৎ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হইল, তাহার আশ্চর্য্য ইতিহাস এই গ্রন্থে আছে। কিন্তু সেই নবজাগ্রত নির্ঝর যখন লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া পৌছিল, তখনই জীবনস্মৃতির রচয়িতা তাঁহার চিত্রশালা রুদ্ধ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ বৈচিত্র্যময় গতিকে আর অনুসরণ করিতে দিলেন না।

তারপর সে যে কেমন করিয়া আপনার জন্মসংস্কারগত বিশ্বানুভূতিকে নানা বাস্তব সত্যের সঙ্গে ক্রমশই সংযুক্ত করিয়া দেশীয় প্রকৃতি ও দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে এবং একদা দেশের প্রাচীনতম সাধনার মূল ধারার সঙ্গে মিশিয়া বৃহৎ ও বিপুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ইতিহাস এ গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। ইংরাজী সাহিত্যের সেই অন্ধ অনুকরণের যুগ, মাঝখানের প্রবল প্রতিক্রিয়ার যুগ এবং আধুনিক কালের দেশীয় প্রাণে প্রাণবান্ সাহিত্যকে সকল মানবের সভায় প্রতিষ্ঠিত করিবার গৌরবময় যুগ—ইহাদের একটা হইতে

অন্যটার অভিব্যক্তির ক্রমগুলি কি এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনেই বা তাহা কি ভাবে অনুসরণ করিয়া দেখা যাইতে পারে—ভাবী কবিজীবনরচয়িতার জন্য এই কাজ অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু কবির অন্তরতর জীবনের 'ভাঙা গড়া জয় পরাজয়ের' ভিতর দিয়া যে একটি বড় অভিপ্রায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন কবি ভিন্ন কে করিবে? আম-দরবারে এই কালের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ একরকম করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু খাস্‌ দরবারে তাঁহার অন্তরের মধ্যে তিনি আপনাকে আপনি না দেখাইলে সেখানকার দরজা হয়ত চিরকাল বন্ধ থাকিয়াই যাইবে।

ছিন্ন পত্র

ইউরোপে কোন বড় কবি বা মনীষী মারা গেলে তাঁহার জীবনচরিত, চিঠিপত্র, তাঁহার সম্বন্ধে ছোট বড় সকল প্রকার জ্ঞাতব্য সংবাদ মোটা ভল্যুমে বাহির হইতে দেখা যায়। কবিদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল যেন কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চায় না—তাঁহারা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তৃপ্তি নাই, যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাকেও সকলের ব্যগ্র দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরা চাই।

এই জন্য অনেক সময় অঘটনের সৃষ্টি হয় একথা সত্য। এমন অনেক লোকের জীবনচরিত বাহির হয়, যাহা বাহির না হইলে জগতের কোন ক্ষতি ছিল না। চিঠিপত্র এমন অনেক প্রকাশিত হয় যাহা হইতে কবি সম্বন্ধে কোন নূতন পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিশেষ কিছুই পাওয়া না গেলে তেমন অনিষ্টের হয় না—কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, যে কবিকে তাঁহার রচনায় বড় বলিয়া জানিয়াছি, চিঠিপত্রে বা জীবনচরিতে তাঁহার মহিমা খর্ব্ব

হইয়া পড়ে। তাঁহার ভাবজীবন হইতে দৃষ্টিকে সরাইয়া বাস্তব-জীবনে ফেলিতেই দেখি যে, মানুষটিকে যেমনটি কল্পনা করিয়াছিলাম, তেমনটি নহে।

এসকল আশঙ্কার কারণ সত্য হইলেও এখনকার কালে কবিদের প্রচ্ছন্ন থাকিবার কোন উপায় নাই। কারণ, একথা সত্য যে তাঁহাদের সম্বন্ধে যতই জানা যাইবে, ততই তাঁহাদিগকে বুঝিবার সাহায্য হইবে। অবশ্য তাঁহাদের জীবনের এমন অনেক দিক্ থাকিতে পারে, যাহার সঙ্গে কাব্যের কোন সম্বন্ধই নাই, যাহা নিতান্তই বাহিরের দিক্। কিন্তু জীবনের ভিতর হইতে যখন কাব্য প্রতিফলিত হইতেছে, তখন জীবনের অন্ধিতে সন্ধিতে যতই প্রবেশ করা যাইবে ততই অন্তরলোকের এমন সকল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে যাহা কাব্যের পূর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অমূল্য। এই জন্য ছোটবড় সকল খবরই চাই—অনেক কিছু সংগ্রহ হইলে তখন তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচক স্যাঁত ব্যভ (Sainte Beuve) যে সকল লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের সকলেরি চিঠিপত্র হইতে ও অন্যান্য নানা ছোটখাট ঘটনা হইতে তাঁহাদের অন্তরের প্রতিকৃতিটি তিনি আঁকিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। জুবেয়ার, মাদাম রোলাঁ্যা শীর্ষক তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে একথা সুস্পষ্ট হইবে। ম্যাথু আরনল্ড অনেক সমালোচনায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

ইহার কারণ, চিঠিপত্র যে শুধুই সংবাদ বহন করিবার কাজ করে তাহা নহে, চিঠিপত্রও মানুষের ভাবপ্রকাশের একটা উপায়। যেমন নাট্যউপন্যাসে, যেমন প্রবন্ধ, গল্প বা গীতি-কবিতায় মনের ভাবকে মানুষ বাহিরে স্থায়ী আকার দান করিয়া সার্থক হয়, চিঠিতেও আর এক রকমে তাহার সেই কার্য্যই সাধিত হয়। উপন্যাসে বা নাটকে ব্যক্তিগত প্রকাশের স্থান অল্প—সেখানে চিত্তভাবকে নানা লোকচরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্রে সাড়া দিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ছোট গল্পে সে ক্ষেত্র আরও একটু সঙ্কীর্ণ—কবিতাতে বা প্রবন্ধে আরও বেশি—সুতরাং সেখানে নিজের মনের কথা বেশ সহজেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে নিবিড় ভাবে মনের কথা বলা যায় চিঠিতে, তাহার কারণ চিঠিতে একটি মাত্র মনের মানুষকে বলা হয়, বাহিরের পাঠকসমাজ সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না।

"যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেম্নি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশ্লেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নাই! এই চারপৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধ কখনোই তা পারে না।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথের নব প্রকাশিত গ্রন্থ 'ছিন্নপত্র' হইতেই উপরের ঐ অংশটী উদ্ধৃত করিলাম। এই পুস্তকের সকল চিঠিতেই ঐ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক কবি ইহাতে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ

হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ইহাতে তাঁহার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনি ধরা পড়িয়াছেন।

সেই জন্য এই চিঠিগুলিতে কোন কলাচাতুরী নাই, ভাষার ইন্দ্রজাল নাই। নানা লোকের হৃদয়ে প্রবেশের জন্য কবিকে স্বভাবতই যে সকল মোহিনী মায়ার আশ্রয় লইতে হয়, নারীর অবগুণ্ঠনের মত যে কারুপূর্ণ আবরণটুকু নহিলে তাঁহার সৌন্দর্য্যই প্রকাশ পায় না, এখানে তাহার কোন আবশ্যকতা ঘটে নাই। কারণ এখানে একজনের কাছেই সব বলা হইয়াছে।

কিন্তু কবির জীবিত কালে এই পত্রগুলি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া ইহাদিগকে তিনি ছিন্ন আকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ সবটা দিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ সঙ্কোচ তাহার কারণ। এইজন্য এই চিঠির টুকরাগুলির মধ্যে সেই ব্যক্তিগত রসটি নাই, চিঠি মাত্রেরই যেটি বিশেষ রস। একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমল শতদলে বিদীর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, এই ছিন্নপত্রগুলিরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পত্র সেই নন্দনগন্ধটুকু বহন করিতেছে বটে, কিন্তু ছিন্ন হইবার বেদনার রক্তলেখা ইহাদের গায়ে লাগিয়া আছে।

কিন্তু না, আমি বোধ হয় ভুল করিতেছি। এ চিঠিগুলি ঠিক ছিন্নদলের মত নয়, কারণ ইহাদের মধ্যে যে একটি ভাব-সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি। ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ—দশবৎসর কালের এই চিঠিগুলি। কিন্তু পড়িতে পড়িতে এত

দীর্ঘকালের ব্যবধান কিছুই অনুভূত হয় না। দশবৎসরে কত বড় বড় পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতে পারে—কত রাজ্য সাম্রাজ্য ভাঙিতে পারে, গড়িতে পারে—কত কীর্ত্তি ভূমিসাৎ হইতে পারে, কিন্তু একটি মানুষের নদীর উপরে নৌকাবাসের জীবনে পরিবর্ত্তন নাই। মালার সূত্রে, ফুলের পর ফুলের মত দিনের পর দিন গ্রথিত হইয়া চলিয়াছে, পূর্ণ বিশ্বসৌন্দর্য্যের পায়ে নিবেদনের একটি সাজি সুগন্ধে আমোদিত হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। কি নিবিড়, কি গভীর, কি আশ্চর্য্য এই মানুষটির অনুভূতি এবং উপভোগ! মনে হয় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য সার্থক যে একজনও তাহাকে এমন একান্ত আগ্রহে, এমন বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে হৃদয় ভরিয়া দেখিয়াছে।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যানুভূতির এই ভাবঐক্য এই ছিন্নপত্রগুলির মাঝখানে সূত্রের মত থাকায় ইহারা আর এলোমেলো ভাবে উড়িতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে এই একটি মাত্র কথা—"হে চির সুন্দর আমি তোরে ভালবাসি।" তাহাই "শেষ কথা" এবং চিরকালের কথা। সোনার ভাবের কালীতে লেখা পরম সুন্দর কথা।

তথাপি এগুলি ছিন্ন করিবার বেদনা আমার মন হইতে মুছিতেছে না। চিঠিকে সাহিত্যের কড়া বাটখারায় ওজন করিয়া তাহার কতটুকু ছাঁটিতে হইবে তাহা হিসাব না করিলেই ভালো হয়। কারণ চিঠিতো আর সাহিত্যের মত করিয়া লেখা হয় নাই, তাহার অলঙ্কারের অভাবই তাহার সকলের চেয়ে

বড় মূল্য। অবশ্য চিঠির মধ্যে ব্যক্তিগত অংশ বেশি থাকিলে তাহা সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য হয় না—কিন্তু এসকল চিঠিতে কেহ তো গয়লার হিসাব বা সংসার খরচের তালিকা প্রত্যাশা করে না। এ তো কাজের চিঠি নয়, ভাবের চিঠি। মানুষকে লেখা হইলেও এস্থলে মানুষ অনেকটা পরিমাণেই উপলক্ষ্য। বোধ হয় বিশ্বপ্রকৃতি যদি ভাষা জানিত এবং তাহার সঙ্গে মোকাবিলায় আলাপের কোন সুযোগ থাকিত, তবে এ চিঠিগুলি তাহারি নিকটে প্রেরিত হইত। সুতরাং এ চিঠিগুলি যেমন ছিল তেমনি বাহির করিলে কি ক্ষতি ছিল!

হিসাব করিয়া দেখি, মানসী, সোনার তরী ও চিত্রা যে সময়ের মধ্যে রচিত হইতেছে, "সাধনা" চলিতেছে, এবং গল্পগুচ্ছ একটির পর একটি করিয়া তৈরি হইতেছে এই চিঠিগুলি সেই সময়ের। "মানসী"র সময়ের চিঠি অতি অল্পই আছে, বোধ হয় শ্রীশবাবুর নিকটে লিখিত গোড়াকার চিঠিগুলি বাদে আর বেশী নাই। অধিকাংশ চিঠিই সোণার তরী ও চিত্রা রচনার সময়ের, এবং প্রায়ই শিলাইদহ ও পতিসর হইতে লিখিত। তখন জমীদারী পরিচালনার কার্য্যে কবি বোটে বাস করিতেছিলেন।

ইহার পূর্ব্বে বাংলাদেশের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ কবির ঘটে নাই। "জীবনস্মৃতি"তে দেখি যে "সন্ধ্যাসঙ্গীত" রচনাকালে চন্দননগরের গঙ্গাতীরে এবং "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখিবার সময়ে গুজরাট অঞ্চলে কারোয়ারের সমুদ্রতীরে বাস ব্যতীত, বিশ্বপ্রকৃতির সহবাস কবির ভাগ্যে বেশি ঘটে নাই।

অবশ্য তাহাতে কবির চিত্ত যে উপবাসী হইয়াছিল এমন নয়—কারণ "যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যে এক মুহূর্ত্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন"—সৌন্দর্য্য উপভোগ বাহিরের আয়োজনের উপর নির্ভর করে না। তথাপি মনে হয় যে এই সময়ে নদীপথে নৌকায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া বাংলার গ্রাম্যপ্রকৃতি ও গ্রাম্যজীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় না লাভ করিলে কবির স্বাভাবিক বিশ্বানুভূতি কখনই বাস্তব রূপ পাইত না। "স্বর্গ হইতে বিদায়", "বৈষ্ণব কবিতা", "পুরস্কার," "বসুন্ধরা", "জীবনদেবতা" প্রভৃতি যে সকল কবিতা ভাবে ও প্রকাশে ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে, যাহাদের অর্থ সীমাবদ্ধ তত্ত্বমাত্র নহে কিন্তু বিচিত্ররূপে ব্যঞ্জনাপূর্ণ, যাহাদের ভিতরকার দৃষ্টি বিশ্বপ্রসারিত, এবং প্রকাশ উপমায় ও রূপে জীবন্ত ও বস্তুগত—আমি তো কখনই মানিতে রাজি নই যে কবি আপনার ভাবজীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া লইবার এমন অবসর না পাইলে সেসকল কবিতায় এরূপ প্রসার বিচিত্রতা ও সত্যতা কদাচ দেখা যাইত।

সুতরাং আমি দেখিতে পাইতেছি যে এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই সকল কবিতাসৃষ্টির ও গল্পসৃষ্টির মূল উৎস পাওয়া যায়। এই যে নিগূঢ় সৌন্দর্য্য উপভোগ এবং তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ, প্রকৃতির সঙ্গে এই যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, ইহার মধ্যে সেই রসটি রহিয়াছে যে রসে কলম ডুবাইয়া কবি তাঁহার অমর কাব্য ও গল্পসকল রচিয়াছেন। সুতরাং সেদিক্ দিয়াও এগুলি পরম আদরের

সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই। উদাহরণ স্বরূপে ৪১ পৃষ্ঠার পত্রখানি লওয়া যায়:—"মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্ব্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মত এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত?" ইত্যাদি। 'যেতে নাহি দিব', 'দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালবাসি হে ধরিত্রী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতার ভিতরকার কথা কি এই চিঠির কথার সঙ্গে সায় দেয় না? এমন প্রায় অনেক চিঠিতে এই সময়কার কোন না কোন পরিচিত কবিতার সঙ্গে ভাবের সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে। শুধু কবিতা নয়—অনেক গল্পের প্লটের ও গল্পরচনার ইতিহাসও এই চিঠিগুলির মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। "সমাপ্তি"র মৃণ্ময়ী ৬০ পৃষ্ঠার চিঠিতে ধরা পড়িয়াছে, ৯৬ পৃষ্ঠার চিঠিতে "ছুটি" গল্পের ফটিক চক্রবর্ত্তী ছেলেটিকে দেখা গিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে এই চিঠিগুলি সেই কবিতা ও গল্পরচনার মতই আর এক রকমের আত্মপ্রকাশ। সেইসকল কথাই অন্য আকারে এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

এগুলি পড়িতে পড়িতে একটি জিনিস কেবলি মনে হয় যে কবির সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয়তা কি আশ্চর্য্যরূপে গভীর! কবিতাতে অবশ্য তাহার পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছি কিন্তু চিঠিতে আরও অধিক করিয়া পাইলাম। চিঠিগুলিতে চিন্তার কথা অল্পই আছে—ছাপা পুস্তকের গন্ধ এখানে সেখানে উঁকি মারিবা

মাত্র • নিরস্ত হইয়াছে। কেবল এই প্রতিদিনের সকাল, দুপুর সন্ধ্যা, রাত্রি—মেঘ, ঝড়, বাদল—নদীর তীর, স্নানের ঘাট—গ্রামের সরল জীবনযাত্রা—ইহার খবর কি দিনের পর দিন দিয়ও তাহা কোনমতে ফুরাইতে চায়! যেসকল সংবাদ অন্য লোকের কাছে তুচ্ছ, যাহা চোখ দিয়া দেখিলেও মনের মধ্যে লেশমাত্র রেখাপাত করেনা, সেই সকল সংবাদ এই পত্রগুলি নিত্য বহন করিয়াছে এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে যে মানুষের জগতের সকলের চেয়ে বড় সংবাদের চেয়ে ইহারা কোন অংশে ন্যূন নহে। বরং জীবনে এইসকল স্মৃতির সঞ্চয় অন্য সকল সঞ্চয়ের চেয়ে মূল্যবান্।

ভাবিয়া দেখি প্রকৃতির এমন পরিপূর্ণ উপভোগ আর কোথায় দেখিয়াছি। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ? কিন্তু তাঁহার সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ যেন হিমাচলে ধ্যাননিমগ্ন অনুত্তরঙ্গ শিবের সঙ্গে সেবারতা পার্ব্বতীর সম্বন্ধের মত। প্রকৃতির সেই গভীরতম প্রাণলোকের সমাহিত ভাবটিই তাঁহার কাছে অধিক চিত্তহারী।

তারপর মনে পড়ে আমিয়েলের জর্ণাল। কিন্তু ফিলসফির ভারে আমিয়েল একেবারে ভারাক্রান্ত—ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতির কত জটিল সমস্যা ও প্রশ্ন লইয়া তিনি ব্যস্ত। ইহার মধ্যে মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যদিচ 'পাষাণগলা সুধার' মত ঝরিয়া পড়িয়াছে, তথাপি এই ছিন্নপত্রের মত আমিয়েলের ডায়ারিগুলি এমন একটানা প্রবাহ রক্ষা করে নাই। স্থানে স্থানে চিন্তার শৈল আসিয়া সেই সোনার স্রোতের পথরোধ

করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তারপর থোরোর 'ওয়াল্ডেনে' প্রকৃতির সহবাসের খানিকটা রস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু থোরোর প্রকৃতিতে বাস আধুনিক সভ্যতার সহিত বিরোধে—তাহা কতকটা রুশোজাতীয়। এমন স্নিগ্ধ সরস সুগম্ভীর আনন্দময় বাস নহে।

বরং আমিয়েলের জর্ণালের সঙ্গেই ছিন্নপত্রের কতকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারণ এই চিঠিগুলিতে যেমন চিত্রের পর চিত্র অঙ্কিত হইয়া চলিয়াছে, সকলগুলিতেই কবির উপভোগ এবং তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের পরিচয় বিদ্যমান—তেমনি আর একটি ভাবের ও চিন্তার মালা চিত্রমালার সঙ্গেই গ্রথিত হইয়া চলিয়াছে যাহা আমিয়েলের জর্ণালের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি এই ছিন্নপত্রে এক জায়গায় সেই জর্ণাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমার মনে হয় তাঁহার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা আরও বেশি করিয়া খাটে,—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। *** অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনোটা ঠিক্ আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায়না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে—কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই, সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়।"

"ছিন্নপত্র"ও সেইরূপ "অন্তরঙ্গ বন্ধু"র মত বলিয়া ইহার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখান নিস্প্রয়োজন। এমনকি, ইহা আগাগোড়া পড়িয়া যাইবারও বিশেষ প্রয়োজন নাই। যেখানে খুসি সেখানে খুলিয়া পড়া যাইতে পারে। সহরের গোলমালের মধ্যে, নানা কাজের ভিড়ে একটুখানি অবসর করিয়া লইয়া আমরা এই বইখানির যেখানে খুলিয়া পড়িব, সেখানেই নিমেষের মধ্যে বাংলার নদীতীরবর্ত্তী গ্রামের সরল সৌন্দর্য্যের উপর দিয়া সমস্ত মনকে বুলাইয়া লইয়া যাইতে পারিব এবং ভাবের রসে আপনাকে সহজেই রসাইয়া পরম আনন্দ উপভোগের অধিকারী হইব। চিত্তের সকল ভার ইহা লঘু করিয়া দিতে তিলমাত্র বিলম্ব করিবে না।

ধর্ম্ম সঙ্গীত

কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে কবি রবীন্দ্রনাথ সেখানকার সাহিত্য-সমাজ কর্ত্তৃক এক সান্ধ্য নিমন্ত্রণে যে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আইরিস কবি য়েটস্ সভাপতি হইয়া রবীন্দ্রনাথের তিনটি ধর্ম্মসঙ্গীতের অনুবাদ পাঠ করেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করেন। কোন্ তিনটি গানের অনুবাদ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।* সংবাদপত্রে

---

* কবি য়েট্‌স্ যে তিনটি কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন—তাহার একটি 'গীতাঞ্জলি'তে, একটি 'নৈবেদ্যে' ও একটি 'খেয়া'তে আছে। (১) 'শ্রাবণঘনগহন মোহে' (২) 'জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যেখানে' ও 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর' এই দুইটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা একত্র করিয়া অনুবাদ—(৩) 'অনাবশ্যক' নামক খেয়ার একটি কবিতা। এই প্রবন্ধ লিখিবার কালে কবিতা তিনটির নাম জানা যায় নাই।

দেখিলাম যে তাহাদের একটিতে ঈশ্বরকে পথিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, আর একটি মৃত্যুর উপরে, যেখানে মাতৃস্তন্য হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইবার উপমা আছে। মৃত্যু সেই এক স্তন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্তনান্তরে মানবশিশুকে পুনরায় আশ্বস্ত করিবার পূর্ব্বে ক্ষণকালীন বেদনা মাত্র—এ ভাবের কবিতা বোধ হয় 'নৈবেদ্যে' আমরা পড়িয়াছি। সুতরাং এটি সম্ভবতঃ গান নয়। পথিকরূপে ঈশ্বরকে দেখা তো বহুস্থানেই আছে, যেমন :—

> কুজনহীন কাননভূমি
> তুষার দেওয়া সকল ঘরে,
> একেলা কোন্ পথিক তুমি
> পথিকহীন পথের পরে।
> হে একা, সখা, হে প্রিয়তম
> রয়েছে খোলা এ ঘর মম
> সমুখ দিয়ে স্বপন সম
> যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে।

য়েটস্ টমাস্ এ, কেম্পিয়সের "খৃষ্টের অনুকরণ" নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকের সহিত রবিবাবুর এই সকল গান ও কবিতার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, "খৃষ্টের অনুকরণের" রচয়িতা যেমন পাপ-বোধের দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়া সকল বাহ্য সৌন্দর্য্যকে ভক্তিসাধনের অন্তরায় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে ভাব আদবেই নাই। তিনি সকল সৌন্দর্য্যে, সকল ভোগের বস্তুতে ভগবানেরই প্রেমের সাক্ষ্য লাভ করিয়াছে, তাঁহার প্রেমই সৌন্দর্য্যরূপে কবির কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। আগষ্ট

মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে এন্‌ড্রুস্ সাহেব 'রবীন্দ্রের সহিত এক সন্ধ্যা যাপন' নাম দিয়া যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেখা গেল যে এক সান্ধ্য সভায় য়েটস্ রবি বাবুর এই ধর্ম্মগীতগুলির ইংরাজী গদ্যানুবাদ আবৃত্তি করিবার কালে বলিয়াছেন যে ভক্তির দিক্ হইতে এ গুলি টমাস্ এ, কেম্পিসের রচনার সঙ্গে তুলনীয় কিন্তু কবিত্বের দিক্ হইতে,—প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিবিষ্টতা ও তন্ময়তার দিক্ হইতে—ফরাসী বিপ্লবের সমকালীন কীট্‌স্, শেলি, ওয়ার্ডস্বার্থের ভাবনিগূঢ় সৌন্দর্য্যানুভূতিময় কাব্যের কথা ইহারা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কবি য়েট্‌সের এই অভিমত পাঠ করিয়া একদা কোন ভক্তিভাজন ধর্ম্মাচার্য্য রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীত সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই আমার স্মরণে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—যে গান আমাদের অন্তরে দুঃসহ পাপবোধ ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা না জাগায়, সে গান উপাসনাকে পরিপূর্ণ করিতে পারে না। কবিত্বের ভাষা শ্রুতিমধুর, সৌন্দর্যাবোধকে সে তৃপ্তিদান করে বটে—কিন্তু তাহার সেই শরবৎ ঋজুগতি (Directness) নাই যাহা একেবারেই গিয়া ঈশ্বরের চরণে উপনীত হয়। আমরা যে কত অকিঞ্চন, কত দীনহীন এবং ঈশ্বরের করুণা যে কি অপার—এই দুই ভাব যুগপৎ যে গানে ব্যক্ত হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসঙ্গীত। রবিবাবুর গানে কবিত্ব যথেষ্ট আছে, কিন্তু এই ব্যাকুলতার সুর নাই।

আর একজন ভক্তিমান ব্যক্তি আমায় বলিয়াছিলেন যে পূর্ব্বেকার গান, যেমন 'বিষয়সুখে মন তৃপ্তি কি মানে' যেমন 'আমি হে তব কৃপার ভিখারী,' কিম্বা সেই পূর্ব্বেকার ভাবে অল্প বয়সে রবিবাবু নিজে যে সকল গান বাঁধিয়াছিলেন, যেমন 'শুনেছে তোমার নাম' বা 'অন্ধজনে দেহ আলো' প্রভৃতি—তাহা তাঁহার আধুনিক গানগুলির চেয়ে অনেক বেশি মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার এখনকার গান কানের উপর দিয়াই ভাসিয়া যায়, হৃদয় পর্য্যন্ত গিয়া পৌছায় না।

য়েট্‌সের মত এবং ইঁহাদের মতে যে পার্থক্য দেখা যাইতেছে তাহার ভিতরকার কারণটা আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। য়েট্‌স্ যে শুধু কবিত্বের দিক্ হইতে রবিবাবুর ধর্ম্মসঙ্গীতকে ভাল বলিয়াছেন আমার তাহা মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে টমাস্ এ, কেম্পিসের গ্রন্থের সঙ্গে এবং প্রাচীন হিব্রু ঋষিদের ভক্তিগাথার সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের এ সকল গান ও কবিতার তুলনাই উত্থাপন করিতেন না। পক্ষান্তরে যে ধর্ম্মাচার্য্যের কথা বলিলাম, তিনি একজন ঈশ্বরনিষ্ঠ সাধক,—তাঁহার হৃদয়কে যখন রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি ভরিয়া দেয় নাই, তখন তাহার কারণটা কি তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা এ সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ সত্য বিচারে গিয়া পৌছিতে পারিব বলিয়া ভরসা হয়।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে উপাসনার সময় পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে ভাবের অনুবন্ধিতাসূত্রে যে সকল গান জড়িত

হইয়া যায়, সেগুলি কবিত্ব হিসাবে উৎকৃষ্ট না হইলেও সাধকের মন সহজেই অধিকার করে। ইউরোপে ধর্ম্মসঙ্গীত এই জন্য বিশেষ ধরণের হয়—তাহার সুর, কথা, ভাব, অত্যন্ত সাধারণ হইলেও বহু দিন ধরিয়া তাহার সঙ্গে মানুষ পরিচিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া গাইবামাত্রই হৃদয়কে স্পর্শ করিতে তাহা তিল মাত্রও বিলম্ব করে না। তাহার স্থানে খুব চমৎকার কোন কবির রচিত গান গাহিলে গির্জ্জায় অধিকাংশ লোকের কখনই ভাল লাগিবে না।

কিন্তু ইউরোপে তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, সেখানকার ধর্ম্মসঙ্গীত শুধু কেন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল প্রকারের আলোচনাই বড় বেশি প্রথাগত, সংস্কারগত ও স্থূলধারণাপূর্ণ হইয়াছে। সেখানকার অধিকাংশ ধর্ম্মসঙ্গীতের বন্দনীয় ভগবান্ জিহোভা হইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম হয়েন নাই। তাঁহার শক্তি, প্রতাপ, ন্যায়দণ্ড, করুণা প্রভৃতি সকল প্রকার ভাবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল রূপকের দ্বারা আচ্ছন্ন। সেইজন্য পশ্চিমের ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিলে হৃদয়ে একপ্রকার ভক্তিরস জাগে বটে; পাপবোধ উগ্র হয় এবং ঈশ্বরের করুণা ও ক্ষমার জন্য ব্যাকুলতার উদ্রেক হয়, কিন্তু আমাদের অন্তরস্থিত তত্ত্বজ্ঞানী মন তৃপ্ত হয় না। সে মাথা নাড়িয়া বলে—উঁহু, এ সকল ভাবোচ্ছ্বাস সত্যপ্রতিষ্ঠ নয়।

ইউরোপের ন্যায় আমাদের দেশে কোন উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে ঐরূপ তত্ত্বাধারশূন্য ভাবুকতাপূর্ণ সস্তাদরের ধর্ম্মগীত

প্রচলনের কোনো কারণ দেখি না। কারণ, আমাদের দেশে অধ্যাত্মসাধনা তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াছে; পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান অধ্যাত্মসাধনার ভিতর হইতে সারসংগ্রহ করিয়াছে। দোঁহে দোঁহার অবলম্বন। উপনিষদকেই বলে বেদান্ত ও শ্রেষ্ঠবিদ্যা, তাহারি উপর ভর করিয়া সকল তত্ত্বশাস্ত্র ভারতবর্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ তাহাকে সাধকের গভীরতম অধ্যাত্ম উপলব্ধির অপূর্ব্ব প্রকাশ বলিয়া চিরদিনই ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে। ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই সেই এক কথা—তাহা হইতে এক ধারা গিয়াছে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে, অন্য ধারা গিয়াছে কাব্য ও সঙ্গীতের দিকে। এই উভয় ধারাই ভারতবর্ষে চিরকাল পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি ইউরোপের ধর্ম্মসঙ্গীতের ন্যায় অ-কবিদের দ্বারা রচিত নহে। তাহা তত্ত্বদর্শী সাধক কবিদিগের রচনা।

তথাপি প্রবন্ধারম্ভে যাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই ভক্তিভাজন ধর্ম্মাচার্য্য রবীন্দ্রনাথের আধুনিক গীতগুলি উপাসনাকে পূর্ণ করিতে সমর্থ নহে, এ কথা বলিলেন কেন? রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেকার ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনার ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত। তখন কবির স্বকীয় কোন অধ্যাত্ম অনুভূতি জাগে নাই—তিনি আপনার অভিজ্ঞতাকে আপনি বাণীরূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং তখনকার গানগুলি প্রচলিত উপাসনার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছে।

কিন্তু তাঁহার আধুনিক গানগুলি যে তাঁহার কাব্যজীবনের চরম পরিণতিস্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা তো প্রথাগত নহে, আত্মগত—দশের জিনিষ নহে, একলার। তাহা হউক্, ইহারা যে সত্য সে বিষয়ে তো সন্দেহ নাই। তবে এক্ষেত্রে প্রথাগত জিনিস স্বাধীন স্বকীয় জিনিসের চেয়ে চিত্তকে অধিক আকর্ষণ করিবে, এ কথার অর্থ কি? সেই আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

এই আমি যে বসিয়া লিখিতেছি, আমার সম্মুখে বর্ষার জলসিক্ত কাননে কত শুভ্র ফুলই ফুটিয়াছে দেখিতেছি। যেন শ্যামদুকুলপরা ছোট ছোট বনকন্যাদের কপালে কেহ শ্বেত-চন্দনের টিপ পরাইয়া দিয়াছে। আমি দেখিতেছি ঐ প্রত্যেকটি পুষ্প যে তরুতে ফুটিয়াছে সেই সমস্ত তরুটিরই সে প্রতিমা। উহার দণ্ডটি তরুকাণ্ডেরই মত, উহার দলে দলে কত শিরা উপশিরা ডালপালার মত কত সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায় আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। দলরাজি আবার পল্লবগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া কোথা হইতে এক আশ্চর্য্য সৌরভ এবং বর্ণ লাভ করিয়াছে এবং আপনাদিগকে সমস্ত বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কোন্ একটি ভাবী সফলতার বীজকোষকে গর্ভের মধ্যে আবৃত করিয়া একটির সঙ্গে একটি কেমন এক সুন্দর বন্ধনে মিলিত হইয়াছে! জীবনের মধ্যে ধর্ম্মের প্রকাশও কি ঠিক এইরূপ নয়? সমস্ত জীবনের হাসিকান্না ভোগচপলতা হইতে ধর্ম্ম স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য কি বিচ্ছেদের স্বাতন্ত্র্য, না পরিণামের স্বাতন্ত্র্য? আমার সমস্ত

জীবন ভরিয়া আমি প্রকৃতির কত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি, কত নরনারীর প্রণয়বন্ধনে কত হাসিকান্নার ভিতর দিয়া যাইতেছি, আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তি আমাকে দিয়া কত কি করাইতেছে, কত কল্যাণ ও অকল্যাণের সৃষ্টি করিয়া জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়া আমায় ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার উপর, অনুভাবের উপর আমার ভাবনা আমার কল্পনা কত রং মিশাইতেছে, তত্ত্বজ্ঞান কত গভীরতর মূলে ইহাদের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধান করিতেছে। এই যে দেখিতেছি আমার জীবনের লীলা—আমার ধর্ম্মবোধ কি এই লীলার অন্তর্গত নয়? সে কি ইহাকে একপাশে সরাইয়া দিয়া তবে প্রকাশ পাইবে? সে কি এই বিচিত্র ডালপালাময় জীবনতরুটিরই শাখাগ্রভাগে ফুলের মত ফুটিবে না? এই সমস্তকেই রূপান্তরিত করিয়া ভগবৎ-প্রসাদের একটি সুগন্ধ হিল্লোল এবং নানা রঙের এক আনন্দ-তরঙ্গ বহাইবে না?

অনেকেই জীবন হইতে ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যকে এইরূপ পরিণামের স্বাতন্ত্র্যরূপে দেখেন না, কিন্তু বিচ্ছেদের স্বাতন্ত্র্যরূপেই দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মুখে যতই অস্বীকার করুন, তাঁহারা সমস্ত জীবনের গান শুনিতে এবং শুনাইতে ভয় পান এবং জীবনটাকে অত্যন্ত কৃশমলিন, অত্যন্ত পাপজীর্ণ কল্পনা করিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াও থাকেন। জীবনের বিচিত্র রাগ—সৌন্দর্য্যবোধের রাগ, মাধুর্য্যের রাগ, কল্যাণের রাগ, কল্পনার রাগ, ভাবের রাগ —এ সমস্ত রাগ এবং রাগিণীর কোন সার্থকতা তাঁহাদের মধ্যে

দেখা যায় না। তাঁহারা রাগবর্জ্জিত রসবর্জ্জিত নীতিবোধকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ শূদ্রের মত,—শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়ের মত—তাঁহাদের কাছে ভাল এবং মন্দ একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট। কারণ, কি যে ভাল এবং কি যে মন্দ তাহা কিনা কতকগুলি বাঁধা বাহিরের নিয়মের উপরই নির্ভর করে। জীবনের অভিব্যক্তিতে যে বাধা ভাল দেখিতে দেখিতে মন্দের মুক্তক্ষেত্রে একেবারে মত্ত অশ্বের মত রাশ-আল্‌গা হইয়া ছুটিয়া যায় এবং মন্দও যে কি বিচিত্র উপায়ে ভাল হইয়া উঠে, মনুষ্য-প্রকৃতির এ সকল নিগূঢ় গুহাগতির মধ্যে তাঁহারা কোনদিনই প্রবেশ করেন না। এ কথা মনেও আনেন না যে, প্রবৃত্তির ঝড় মানুষের মধ্যে অনিবার্য্যরূপেই জাগে, কিন্তু তাহারি ভিতর দিয়াইতো ভোগবিরত অচঞ্চল শান্তির মধ্যে মানুষ আবার উত্তীর্ণ হয়। পঙ্ককে দেখিয়া পঙ্কজকে নিন্দা করে সেই, যে মূর্খ—কারণ যে আকাশে পঙ্ককে উদ্ভেদ করিয়া পঙ্কজ মাথা তোলে তাহা উজ্জ্বল নির্ম্মল আকাশ, সেইখানেই সে আপনার সমস্ত সুরভিকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দেয়।

পাপ-বোধ ধর্ম্মকে সেই জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবারই বোধ, জীবনকে ফুলে ফলে বিকশিত করিবার বোধ নয়। অবশ্য ধর্ম্মজীবনে তাহার কোন স্থান নাই এত বড় দুঃসাহসিকের কথা কোন্ মুখে বলিব, কিন্তু সে স্থান কেমনতর? এই বর্ষার পূর্ব্বে যেমন উত্তপ্ত মাটিফাটা গ্রীষ্ম গিয়াছে, তাহারি মত। গ্রীষ্মের শোষণই যে বর্ষার মেঘকে জন্মদান করিয়াছে। গ্রীষ্মের

ঝড়ই যে তাহাকে দিক্‌দিগন্তে চালিত করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে, গ্রীষ্মের তাপ মাটীর আগাছা-পরগাছাকে শুকাইয়া মাটীর সমস্ত দূষিত বীজকে দগ্ধ করিয়া ভূমিকে ফলধারণযোগ্য করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই গ্রীষ্মের পরিণামই যে বর্ষা, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও যেমন সে কথা আমাদের অত্যন্ত জানা, তেমনি পাপ-বোধের শোষণ ও দাহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আনন্দ না জাগে, যদি না জানি যে এই জীবনেরই উপর আমার ফুল ফুটিবে, গন্ধ ছুটিবে, বর্ণ ধরিবে, মধুমক্ষিকার মেলা বসিবে, তবেত মারা গেলাম! তবে যে দাহ দাহই থাকিল, বর্ষণের মেঘকে সে তৈরী করিল কোথায়? বৈরাগ্য এবং রাগ, পাপের দাহ এবং সান্ত্বনার সুধা একই সময়ে আসা চাই, তবেই প্রাণ বাঁচে। নহিলে সমস্তই কি ভয়ঙ্কর কালো, কি শূন্য, কি অন্ধকারময়!

শুধু 'না'র দিক্ দিয়া মানুষের কোন ভাল করা যায় না— 'হাঁ' চাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম এখন যে পরিবর্ত্তনের দিকে চলিয়াছে, তাহাতে সে এই 'হাঁ'র দিক্‌টাকেই বড় করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু তাহার ইতিহাসে বরাবরই এই ভাবাত্মক দিক্‌টার অভাব থাকিয়া গিয়াছিল। সে 'প্রেমে মুক্তি' বলিয়াছে, কিন্তু সেই প্রেমটার প্রকাশ সমস্ত জীবনের মধ্যে যে কি রকম তাহার কোন আভাস দেয় নাই। ব্রাউনিং প্রভৃতি আধুনিক কবির কাব্যের মধ্যে বরং খানিকটা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ তাঁহারা 'না'কে একেবারে অস্বীকার করিয়া জীবনের ভিতর হইতে ধর্ম্মের ফুলকে ফুটাইয়াছেন—সমস্তকেই 'হাঁ'

বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 'Everlasting yea'—চিরন্তন হাঁ। সেইজন্য ব্রাউনিং এর মধ্যে পাপবোধ যথেষ্ট নাই এমন অপবাদও কেহ কেহ দিতে ছাড়েন নাই। বস্তুতঃ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম লইয়া তুমুল আন্দোলনাদির মধ্যে এই কথাটাই সত্য যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্গে খ্রীষ্টান মানুষের আজিও পূরা বনিবনাও হয় নাই। সে মানুষ জীবনের সম্ভোগে ভরপূর আর তাহার ধর্ম্ম জীবনের আনন্দকে সৌন্দর্য্যভোগকে ডরাইয়া চলে। এই কারণে সে মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম এখনও প্রতি দিনের প্রতি কাজের, প্রতি নিশ্বাসপ্রশ্বাসের, অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। সে অনেকটা পরিমাণে রবিবারের এবং গির্জ্জার জিনিস হইয়া আছে। অবশ্য সাহিত্য এবং শিল্প তাহাকে ক্রমাগত জীবনের ভিতরের দিক্ হইতে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য সাধনায় রত রহিয়াছে।

আমার বিশ্বাস যে কবিরাই জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের বিচ্ছেদকে ঘুচাইয়া দেন। তাঁহারাই জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যকে ঐ পরিণামের স্বাতন্ত্র্যরূপে দেখান। তাঁহাদের চাপো, আর মারো, আর গাল দেও—জীবনের আনন্দকে বাদ দিয়া বৈরাগ্য প্রচার করিতে তাঁহারা কোনমতেই পারিবেন না।

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়ে;
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়—
তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর একি চপলতা!
কেন হাস্য পরিহাস, প্রণয়ের কথা

কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস্ এ সংসারের সহস্র অলসে!
দিয়াছি উত্তর তারে, ওগো পক্ককেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ!
যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্ত-বেদনায়
ধ্বনিত মানবপ্রাণ, আমার বীণায়
দিয়াছেন তারি সুর,—সে তাঁহারি দান,
সাধ্য নাহি নষ্ট করি সে বিচিত্র গান!

ইহারি জুড়ি কবিতা ব্রাউনিংয়ের "ফ্রালিপো লিপি।" ফ্রালিপো লিপি এক মধ্যযুগীয় চিত্রকর। তিনি সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এক মঠে ছিলেন, কিন্তু তাহাদের অনুমতিক্রমে কেবল স্বর্গের দেবদূত, পরী এবং অন্যান্য কাল্পনিক ছবি না আঁকিয়া মধ্যে মধ্যে জীবনের আনন্দে রাজপথের জীবন্ত নর-নারীদের ছবি আঁকিয়া ফেলিতেন। এবং মঠের পক্ককেশ সন্ন্যাসীদের এই উত্তরই দিতেন,—"আমার তুলিতে সাজে তাঁহারি আদেশ!"

আমাদের ভারতবর্ষে জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের যে তেমনতর বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তাহারও প্রধান কারণ আমার এই মনে হয় যে, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ—কবি এবং সাধক ছিলেন একাধারে। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তাহার অবসানকালে শক্তিপূজা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিলেও বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাবপ্লাবনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। বাংলা গীতসাহিত্যে বৈষ্ণবই একা রাজত্ব করিতেছে।

বৈদিক ঋষিরা কবি, উপনিষদকারগণ কবি, কবীর, নানক, দাদূ অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর কবি—সুতরাং কেমন করিয়া আমাদের দেশের ধর্ম্মসাহিত্য রূপরসের দাবীকে অগ্রাহ্য করিবে, বিশ্ব-সৌন্দর্য্যকে নির্ব্বাসনদণ্ড দিবে? ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসেও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে একসময়ে পাপবোধ সকল রস ও সৌন্দর্য্য হইতে ধর্ম্মকে সরাইয়া লইয়া অত্যন্ত একদেশবর্ত্তী, শুষ্ক এক পদার্থ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এখানেও এক মহাকবির গান সেই ধর্ম্মকে সেই একদেশের অতিপ্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে ভারতের চিরন্তন রসসাধনা ভক্তিসাধনার ধারার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতেছে।

ম্যাক্‌লিফ সাহেব "শিখধর্ম্ম" নামক তাহার রচিত গ্রন্থে গুরু নানকের যে সকল ভজন সংগ্রহ করিয়া ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং ক্ষিতিমোহন বাবু ওয়েষ্টকট্ প্রভৃতির উপর নির্ভর না করিয়া কবীরের যে বাক্যাবলী মূল হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে একটী কথা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীতের সঙ্গে আর এই ধর্ম্মবাক্যগুলি ভাবে, রসে, প্রকাশে এমন কি অনেক সময় উপমা অলঙ্কারের সাদৃশ্যেও এক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ!
কহৈঁ কবীর, বিছুড় নহিঁ মিলিহো
জোঁ্যা তরবর ছোড় বনমাধরী—

"কবীর কহেন, তরুকে ছাড়িয়া যেমন বনকে খুঁজিয়া পাইবে না—তেমনি তিনি বিচ্ছিন্নভাবে মিলিবেন না।" ঐ একই কথা!

কবীর, নানক প্রভৃতি ভক্তদের গান পাপবোধের দ্বারা আক্রান্ত নয়। আমারি ভিতর সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমারি জীবনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য্য অবাধে ফুটিতেছে—তাহাদের গান এই আনন্দের সুরে বাঁধা।

য়া ঘট ভীতর চন্দ্রসূরহৈঁ য়াহী মে নৌলখতারা—আমারি মধ্যে চন্দ্রসূর্য্য, আমারি মধ্যে নব লক্ষ তারা প্রকাশিত—(কবীর)। আজি যত তারা তব আকাশে, সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে—(রবীন্দ্রনাথ)। যাবহী মুরত বীচ অমুরত, মুরতকী বলিহারী—সকল মূর্ত্তিরই মধ্যে অমূর্ত্ত; বলিহারী যাই সকল মূর্ত্তির (কবীর)। আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি—(রবীন্দ্রনাথ)।

এইরূপে দেখা যাইবে যে ইহাদের গানের ভিতরকার তত্ত্বটিই এই যে—বিশ্বকে কোথাও বাদ দেওয়া নয়, রূপকে কোথাও অস্বীকার করা নয়, কিন্তু আত্মার আনন্দের দ্বারা সমস্তকে পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করা। আশ্চর্য্য ইহাদের উপলব্ধি, পরিপূর্ণ ইহাদের আনন্দোদ্বোধন এবং রসানুভূতি—এমন আশ্চর্য্য ভক্তি কবিতা কোনও দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

কবি য়েটস্ কেন, ইউরোপীয় কোন ভাবুকই আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে এই মধু'র উৎসটির সংবাদ পান নাই। তাঁহারা সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত পাইয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন এবং এক নূতন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কারের যেমন আনন্দ

তেমনি এক আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু যে মাণিক তাহাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, সে যে একটি আধটি নয়—ভারতবর্ষের ভাবসমুদ্রের তলায় সে যে কত যুগ যুগান্তর হইতে কত বিচিত্ররূপে সঞ্চিত হইয়া আছে, সে খবর যে দিন প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সেদিন বিশ্বসাহিত্যের ঐক্যতান সঙ্গীতে এক নূতন সুরের আবির্ভাব ঘটিবে। হয়ত ঐক্যতান সঙ্গীত যাহার অভাবে সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছেনা সেই সব-মেলানো সববেসুরা-ডোবানো সুরই আসিয়া সকল বিচ্ছিন্ন গীতকে মিলিত করিয়া সকল মানবকে এক আনন্দসভায় আহ্বান করিবে। সেদিন দূরে নাই। বিবাহের প্রথম বাঁশীটি বাজিয়াছে—ঐ একটি সানাইয়ের করুণমধুর রাগিণী। পূর্ব্ব গগনকে প্লাবিত করিয়া এখন জীবনের সায়াহ্নে পশ্চিমগগনের বিজয়গৌরবচ্ছটাকে সে সুধাস্নিগ্ধ করিতে গিয়াছে। রাত্রি আসন্ন—আবার অরুণোদয়ের অপেক্ষায় সবাই বসিয়া আছে—এ অরুণোদয়ে সমস্ত মানুষের সম্মিলিত জাগরণ ইতিমধ্যে, "Watchman, what of the night ?"

গীতাঞ্জলি।

(১)

গীতাঞ্জলি পশ্চিমের সাহিত্যের অরণ্যে দাবানলের মত গিয়া পড়িয়াছে, এ সংবাদ যখন আমরা প্রথম পাই, তখন এই ঘটনার আকস্মিকতা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। রবীন্দ্র-নাথের গীতাঞ্জলিকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই, সুতরাং তাহাকে লইয়া একটা মাতামাতির ব্যাপার কেন হইল, তাহার কারণটা আমরা ঠিকমত বাহির করিতে পারি নাই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি যে কেবলমাত্র বাংলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ নয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহা জানি-তেন না। তাহাতে পাঁচ সাজির ফুল একত্র করা হইয়াছিল। নৈবেদ্যের অনেক ভাল ভাল কবিতা, খেয়ার বহু কবিতা,

গীতাঞ্জলির গান এবং গীতিমাল্যেরও প্রায় ১৫।১৬টি গানের অনুবাদ ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজী গীতাঞ্জলি এক প্রকার রবিবাবুর শেষ বয়সের কবিতার "কষ্টিপাথর"।

আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন অক্সফোর্ডে বন্ধুজনসভায় রবিবাবুর গোটাকতক বাছা বাছা কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে তখন রবিবাবুর নিজ কাব্যের অনুবাদচেষ্টা অসম্ভবের রাজ্যে বাষ্প মুড়ি দিয়া নিদ্রিত ছিল—সে যে সম্ভবের দেশে কোনদিন পক্ষবিস্তার করিবে, এমন স্বপ্নও কেহ দেখে নাই। আমি তাই নিশ্চিন্ত মনে একটা দুঃসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলাম। আমার রচনার সৌষ্ঠব বা কলাচাতুর্য্য, ভাষার মাধুর্য্য বা বিশুদ্ধি, উৎকৃষ্ট কি মাঝারি কি নিকৃষ্ট সে দিকে কেহ লক্ষ্যমাত্র করিল না—আমি বাংলাকাব্যের পরিচয়বহনকার্য্যে সেই পাদপহীন দেশে স্বচ্ছন্দে দ্রুম বলিয়া চলিয়া গেলাম।

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালীর অনেকগুলি কবিতার সঙ্গে গোটা দুইতিন মাত্র নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। আমার দু-একজন বন্ধু নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতাগুলিকেই সর্ব্বোত্তম বলাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিলেন—"প্রেমের কবিতা আমাদের দেশে এত জমিয়াছে যে পাঠকেরা আর তাহাতে স্বাদ পায় না। টেনিসন, ব্রাউনিং, জর্জ্জ এলিয়ট প্রভৃতির 'বস্তুতন্ত্র' সাহিত্যেও জগৎটা এমনি গায়ে ঘেষিয়া দাঁড়াইয়াছে, যে তাহার 'মায়া' যেন সূর্য্যাস্তে মেঘের

চতুর্দ্দিকের চঞ্চল বর্ণচ্ছটার মত আর হিল্লোলিত হইয়া বেড়ায় না—সব যেন বড্ড স্পষ্ট, বড্ড নিরেট, বড্ড বেশী গোচর! আমরা তাই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের মোহাঞ্জন চোখে পরিতে চাই; সেই অঞ্জন পড়িয়া জগৎকে, মানুষকে, মানুষের প্রেমকে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। ইয়েট্স প্রভৃতি কেল্টিক্ অভ্যুত্থানের কবিদল, ফ্রান্সিস্ টম্পসন, জন্ মেস্‌ফিল্ড প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ কবিগণ সেই অঞ্জন চোখে মাখাইয়াছেন বলিয়া পাঠকেরা তাঁহাদের আদর করে। নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতার মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অনির্ব্বচনীয় রস আছে—রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতায় সে রস নাই।"

কথাটা তখন আমার মনে লাগিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক ইংরেজি কাব্যের সহিত আমার পরিচয় যথেষ্ট ছিল না বলিয়া আমি ভাল করিয়া কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। ইয়েট্সের কাব্য লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইয়েট্সের কাব্যের মধ্যে বিশেষত্ব যে কি, তাহা বুঝিলাম না। প্রাচীন কেল্ট-পুরাণকাহিনীকে ছন্দোবদ্ধ করাতেই যদি কোন বিশেষ বাহাদুরী থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা। ইংলণ্ডে সবাই বলিত ইয়েটস্ এক-জন অসাধারণ "মিষ্টীক্"। যাহা কিছু দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালী তাহাকেই "মিষ্টীক" আখ্যা দেওয়া হয়, ইহাই জানিতাম। এখনকার কালের সাহিত্যে হঠাৎ সে দক্ষিণে হাওয়া মাধবীবনে পুষ্পবিকাশ বন্ধ করিয়া পূবদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া পূবে হাওয়া হইয়া আকাশকে রহস্যগম্ভীর জলদজালে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, সে

খবর কে জানিত। ইউরোপের ইতিহাসে পড়িয়াছি মধ্যযুগকে বলিত Dark ages, অন্ধকারের যুগ। সেই অন্ধকারের খনি খুঁড়িয়া যে রাশি রাশি মধ্যযুগের ভক্ত, সাধক ও কবিদের মণি-মালা গাঁথিয়া তুলিবার প্রভূত আয়োজন চলিতেছে, তাহাই বা কে জানিত! সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অব অ্যাসিসি, ম্যাডাম গেঁয়ো, রিচার্ড রোলে, জুলিয়ান অব নরবিচ, ক্যাথারিন ডি সায়েনা, ইত্যাদি ভক্তদের নামই লোকে ভুলিয়াছিল। এ ছাড়া কোথায় পারসিক, কোথায় ভারতবর্ষীয়, কোথায় চৈন,—সকল দেশের "মিষ্টীক"দের যে তলব পড়িয়াছে, এ দেশে বসিয়া শেক্সপীয়র, বার্ক, টেনিসন্ পড়িয়া পরীক্ষা পাশ করিবার উদ্যোগে সে-সব সংবাদের কিছুই আমাদের কাছে আসিয়া হাজির হয় নাই। পশ্চিমের লোকেরা জানে যে মহাভারতের প্রায় আড়াই লক্ষ শ্লোক এবং রামায়ণের আটচল্লিশ হাজার শ্লোক এবং যত রাজ্যের অসম্ভব অলৌকিক গাঁজাখুরী গল্পই হিন্দুসাহিত্য। কেবল উপমা, অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের ঘটা, শব্দের চাতুর্য্য এবং তত্ত্বের কচকচি তাহাকে এমনি ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে আপাদমস্তক গহনামণ্ডিত দেহের মত, তাহার গড়ন যে কেমন, সৌন্দর্য্য যে কেমন, তাহা বুঝিবারই জো নাই। আমরাও তেমনি জানি যে পশ্চিমের সাহিত্য মানে সেই শেক্সপীয়র এবং টেনিসন্ এবং তাহাদের সমালোচকবর্গ। পশ্চিমের লোকেরা যখন আমাদের গালি দেয় যে তোমাদের কলাবোধ নাই, আমরা পাল্টা জবাব দিই যে, ও বোধটা তোমাদের জন্য কায়েম করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা

তো তত্ত্বের ধার ধার না, ঐ বস্তুর বোধ ভিন্ন আর কোন্ বোধ তোমাদের জন্মিবে বল ?

যাহাই হউক আমাদের অজ্ঞাতসারে বিধাতাপুরুষের গোপন দূতেরা হাওয়ার মুখে পশ্চিমের শিল্পসাহিত্য হইতে কলাসৌষ্ঠববোধের বীজ এদেশে আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং পূর্ব্ব দেশের ভারি ভারি তত্ত্বের বীজ ও সাধনার বীজ ওদেশে লইয়া যাইতেছিল। কেবল আমাদের সঙ্গে পশ্চিমের প্রভেদ ছিল এই যে, আমাদিগকে যে কারণেই হোক্ বাধ্য হইয়া পশ্চিমের সাহিত্য পড়িতে হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে সেই সাহিত্য হইতে রস আদায় করিয়া আমাদের নিজেদের সাহিত্যের সঙ্গে তাহার একটা সজীব সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও হইয়াছিল। এইরূপে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে যে আহার পাইয়াছিলাম তাহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু বিদেশীরা আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই জানিত না—শুধু জানিত এই যে হিন্দু সাহিত্যে অনাবশ্যক মালমসলা এতই অধিক যে তাহার মধ্য হইতে রস আদায় করা বিষম শক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের উপমার আড়ম্বরের এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুপ্রাসের ঘটার যেটুকু রস পশ্চিমীরা চাখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল।

সকলেই জানেন যে ইংরেজী গীতাঞ্জলি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহা যে এক মুহূর্ত্তেই ইংরেজ পাঠকের মন হরণ

করিয়াছিল, তাহা কেবল ভাবের সৌন্দর্য্যের জোরে নয়, ভাষার ও রচনার আশ্চর্য্য কলাসৌষ্ঠবের জোরে।

Have you | not heard | his si | lent steps? |
He comes, | comes, | ever comes |

তোরা শুনিস্‌নিকি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি ?
সে যে আসে, আসে, আসে।

গদ্যানুবাদে ছন্দের এমন দোল ইতিপূর্ব্বে ইংরেজী সাহিত্যে কাহারও রচনায় প্রকাশ পায় নাই। হুইট্‌ম্যান্ মিল বাদ দিয়া গদ্যে কাব্য রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে গদ্যই হইয়াছে, কাব্যের ভাষার ললিত নৃত্যগতি সে গদ্যে জাগে নাই। এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার Towards Democracy নামক গ্রন্থে সেই একই প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু তিনি হুইটম্যানী ধাঁচার ভাষা ও ভঙ্গিমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন—তাঁহার গদ্যের একটানা প্রবাহে ছন্দের তরঙ্গদোললীলা জমে নাই। সেই জন্য গীতাঞ্জলির ছন্দযুক্ত গদ্যের তুলনা খুঁজিতে গিয়া ইংরেজ সমালোচকবর্গকে হিব্রু সামগাথার (Psalms) কথা পাড়িতে হইয়াছে।

তারপর শুধু ছন্দ নয়, শুধু ভাষার শিল্পচাতুর্য্য নয়, এ কবিতায় প্রাচ্যদেশসুলভ অলঙ্কারবাহুল্য পশ্চিমবাসিগণ একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই। অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণীতে যে অলঙ্কার সাজে না, কারণ—

অলঙ্কার যে মাঝে প'ড়ে
মিলনেতে আড়াল করে
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝঙ্কার

—সে কথাটি হয়ত ও-দেশের লোকেরা ভাল করিয়া ভাবে নাই। অলঙ্কার অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণীর গভীরতাকে ঢাকুক বা না ঢাকুক্, সে যে কবিতার কলাসৌষ্ঠবকে নষ্ট করে, ইহাই তাহার বিরুদ্ধে সকলের চেয়ে প্রবল অভিযোগ। অতএব এই নিরাভরণ সরল কবিতার বিরল সৌষ্ঠব পশ্চিমের রসগ্রাহীদিগের মনকে এক মুহূর্ত্তে অধিকার করিয়াছিল।

অলঙ্কার বাদ দিয়া একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া কলামূর্ত্তি গড়িবার সাধনা এখনকার কবিদের একটি প্রধান সাধনা। এ কাল যে আবরণ মোচন করিবার কাল—বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারের একটি একটি করিয়া আবরণ খসাইয়া সমাজকে, মানুষকে, মানুষের সম্বন্ধগুলিকে, বিশ্বজগৎকে একেবারে তাহার যথাযথ মর্ম্মস্থানে দেখিবার জন্য এ কালের মানুষের মন যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রমাণ আধুনিক সাহিত্য হইতেই প্রচুর পাওয়া যায়। হেন্‌রিক্ ইবসেন্, মেটারলিঙ্ক, বার্নাড শ, এচ জি ওয়েল্‌স্, হাউপট্‌ম্যান্, বদ্‌লেয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যকগণের যে-কোন রচনা পড়িলেই দেখা যাইবে যে, হয় সমাজের কোন পাকাপোক্ত সংস্কারের পর্দ্দা তুলিয়া সমাজের ভিতরকার জীবননাট্যলীলাকে তাঁহারা উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছেন, নয় স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধঘটিত সংস্কারকে

ছিন্ন করিয়া তাহাদের সম্বন্ধের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কোন-না-কোন জায়গায় তাঁহাদের আঘাত আবরণ ছিন্ন করিবার জন্য উদ্যত। সাহিত্যের এই ভিতরের চেষ্টা বাহিরে নিরাভরণ ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সাহিত্য রচনার কোন আলঙ্কারিক প্রথা বা নিয়ম (Conventions) এ কালের সাহিত্যিকেরা মানেন না। সেই জন্য তাঁহাদের রচনা সময়ে সময়ে এত ন্যাড়া হইয়া পড়ে যে, পড়িয়া কোন রসই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার প্রধান কারণ তাঁহারা অনেকেই নিজেদের সম্বন্ধে অতি-সচেতন। আমি একটা কিছু বলিতেছি, আমি এমন করিয়া লিখিয়া থাকি, আমি ভাষার বা সাহিত্যিক প্রথাপদ্ধতির ভারি একটা বদল করিয়া দিতেছি—এ কথা কোনো কবি বা সাহিত্যিক লিখিবার সময়ে ভাবিলেই তাঁহার রচনা কখনই সরলতার মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিবে না। অবলীলাক্রমে যে কাজটি হয়, তাহাতেই সৌন্দর্য্য ফোটে। যে গায়ক গানের প্রত্যেক তালটিতে লয়টিতে অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দেয় অর্থাৎ সে সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহার গানের মাধুর্য্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই জন্য আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যখন ভাবের প্রেরণার হাতে কবিরা আপনাদিগকে সমর্পণ করেন, তখনই তাঁহাদের সঙ্গীত ফুলের মত রঙে ও গন্ধে পূর্ণ হইয়া ফোটে ; ঢেউয়ের মত কলক্রন্দনে বাজিতে থাকে ; বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দের সঙ্গে একাসন গ্রহণ করে। ইউরোপে আধুনিক কালে একজন কবিও নাই, যিনি এমনি আত্মভোলা

সরল। সেই কারণে তাঁহাদিগকে বলিতে হয় এবং তাঁহারাই আপনাদিগকে বলিতে সুরু করিয়াছেন—

তোমরা কেউ পারবেনা গো
পারবেনা ফুল ফোটাতে।
যতই বল যতই কর
যতই তারে তুলে ধর
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত কর বোঁটাতে।
তোমরা কেউ পারবেনা গো
পারবেনা ফুল ফোটাতে।

তাঁহাদের কাব্যরচনা ঐ বোঁটায় আঘাত করা মাত্র—আলঙ্কারিক প্রথাকে ভাঙিবার প্রয়াস মাত্র—কিন্তু ফুল ফুটিয়াছে কোথায়? সেই ফুল ফুটিয়াছে "গীতাঞ্জলি"তে। সেই জন্য তাহার বাহ্য সৌষ্ঠবেই ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের মন সর্ব্বপ্রথমে ভুলিয়াছিল।

(২)

আমি বলিয়াছি যে দ্রাক্ষা হইতে মদ চোলাইয়া লইবার মত বাস্তব সাহিত্য নিঙ্‌ড়াইয়া যেটুকু রস আদায় করিবার তাহা পূর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া অবশেষে পশ্চিমের সাহিত্যের রসপাত্র রিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্যয়টে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স্‌, টেনিসন প্রভৃতি কবিদিগের কাব্যে এখনকার কালের মানুষের মন আর রস পাইতেছিল না। এখন নূতন সাকীর প্রয়োজন। বাস্তব

লোকের রসাস্বাদন তো হইল, এবার অতীন্দ্রিয় লোকের মধু যে কেমনতর তাহা আস্বাদন করা চাই। একদল নূতন সাকী অত্যন্ত আভরণহীন, ছায়ার মত না-যায়-ধরা না-যায়-ছোঁয়া গোচের আধারে সেই 'নন্দন-বন-মধু' ভরিয়া আনিলেন এবং রসপিপাসুদিগকে বিতরণ করিলেন। ইয়েটস্ প্রভৃতি কেল্টিক অভ্যুত্থানের কবিগণ, ফ্রান্সিস্ টম্প্সন্ প্রভৃতি 'মিষ্টিকে'র দল মিষ্ট রস পরিবেষণে আসর জম্কাইয়া পুরাতন সাকীদিগের রসভাণ্ডারে একেবারেই কুলুপ লাগাইয়া দিলেন। এখন হইতে অতীন্দ্রিয় লোক এবং বাস্তব লোকের মধ্যে যে পর্দ্দা ছিল, তাহা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উড়িতে লাগিল। কবির সেই ক্ষণিকার "এক গাঁয়ে" কবিতার মত এই দুই লোকের মধ্যে রহস্যলীলা চলিতে লাগিল মন্দ না—

> "তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
> আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে ;
> তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা
> আমার বনে কদম ফুটে ওঠে !"

সেখানকার হাওয়া আসিয়া এখানকার পুষ্প ফোটায়, সেখানকার পরীদের গান এখানকার বনমর্ম্মরে নদীনির্ঝরে শোনা যায় এবং নবীন সাকী সেই গান শুনিয়া গাহিয়া ওঠেন—

> Fairies, come take me out of this dull world
> For I would ride with you upon the wind,
> Run on the top of the dishevelled tide
> And dance upon the mountains like a flame !

ওগো পরীরা, এই নিরানন্দ জীর্ণ জগৎ থেকে আমায় নিয়ে যাও,
আমায় বের করে নিয়ে যাও!
তোমাদের সঙ্গে আমি পবন-মাতঙ্গীর পৃষ্ঠে চ'ড়ে ছুট্‌ব,
বন্যা যখন তার কুন্তল এলিয়ে দেবে,
তার চূড়ায় চূড়ায় আমি চল্‌ব,
এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে অগ্নিশিখার মত নৃত্য করব!
—The Land of Heart's Desire (W. B. Yeats).

ইঁহারা বলেন যে এই বাস্তব জগৎ তো আসল জগৎ নয়—সেই অদৃশ্য ছায়ার জগৎই আসল জগৎ। কারণ যাহাকে বাস্তব বলিতেছ, তাহার বস্তুত্ব কোথায়? সীমা যে ক্রমাগতই তাহার সীমারূপ পরিত্যাগ করিতেছে, সে কথাটা তো আজ বিজ্ঞান অণুপরমাণুর মধ্যে পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিতেছে। ইয়েট্‌স্ তাঁহার The Shadowy Waters নামক পরম রমণীয় আর একটি নাট্যে নায়কের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

All would be well
Could we but give us wholly to the dreams,
And get into their world that to the sense
Is shadow, and not linger wretchedly
Among substantial things; for it is dreams
That lift us to the flowing, changing world
That the heart longs for.

যদি স্বপ্নের হাতে আমরা আমাদের ছেড়ে দিতে পারতুম,
সে কি চমৎকার হ'ত!

যে জগৎটা ইন্দ্রিয়ের কাছে ছায়ার মত,
যদি সেই জগতে প্রবেশ পেতুম,
যদি কঠিন বস্তুগুলোর মধ্যে হতভাগ্যের মত
দিন গোঁয়াতে না হ'ত !
যে জগৎ কেবলি ব'য়ে চল্‌ছে, কেবলি বদ্‌লে চল্‌ছে,
হৃদয় যার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে—
ওগো এই স্বপ্নই যে আমাদের সেই জগতে পৌঁছে দেবে।

এখনকার কাব্যের এই জগৎ—এই flowing changing world। এই বাস্তব জগতের মাঝখানেই সেই অদৃশ্য জগৎ; এই বাস্তব রাজ্যের মধ্যেই সেই ছায়ার লীলা, সেই স্বপ্নের গতায়াত; এই "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" ফ্রান্‌সিস্‌ টম্পসনের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে এই একই ভাবের সাক্ষ্য পাওয়া যায়—

O world invisible, we view thee,
O world intangible, we touch thee,
O world unknowable, we know thee,
Inapprehensible, we clutch thee !
Does the fish soar to find the ocean.
The eagle plunge to find the air—
That we ask of the stars in motion
If they have rumour of thee there ?
Not where the wheeling systems darken,
And our benumbed conceiving soars !—

The drift of pinions, would we hearken,
Beats at our own clay-shuttered doors.

হে অদৃশ্য জগৎ, আমরা তোমায় দেখ্ছি,
হে অস্পর্শ জগৎ, আমরা তোমায় স্পর্শ করছি;
হে অজ্ঞাত জগৎ, আমরা তোমায় জান্ছি;
হে ধারণায় অগম্য, আমরা তোমায় মুষ্টি দিয়ে ধরছি।
সমুদ্রকে পাবার জন্যে মাছকে কি উড়তে হয়?
আকাশকে অনুভব করবার জন্যে পাখীকে কি
ডুব দিতে হয়?
যে অগণ্য গ্রহচন্দ্র শূন্যপথে বেগে ঘূর্ণ্যমান,
তারা তোমার খবর পেয়েছে কি না সে কথা আমরা
জিজ্ঞাসা করছি কেন?
যেখানে সেই চক্রপথে ভ্রাম্যমান গ্রহেরা অন্ধকার
জমিয়ে আছে,
আমাদের মন উড়তে গিয়ে হতচেতন
হ'য়ে ফিরে আস্ছে—
সেখানে নয় সেখানে নয়।
আমরা যদি শুন্তে পেতুম তবে দেখ্তুম যে স্বর্গের পাখার ব্যাধুনন
আমাদের এই দেহের মৃদর্গলবিশিষ্ট দ্বারের কাছেই শোনা যাচ্ছে।

গীতাঞ্জলির কবিতায় এই অদৃশ্য, অস্পর্শ, অজ্ঞাত জগতের রূপস্পর্শ, রসগন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অসন্দিগ্ধ রূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই নবীন সাকীর দল এই কবিকে তাহাদের সকলের সেরা জানিয়া তাঁহারি ললাটে জয়মাল্য বাঁধিয়া দিয়াছে

এবং কাব্যের কুঞ্জবনে তাঁহাকে রত্ন-আসনে উপবেশন করাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জগৎও "flowing changing world" চিরবহমান চিরপরিবর্ত্তমান জগৎ—"খ'সে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবার" জগৎ।

পাগলকরা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন পানে
রয়না বাঁধা বন্ধে রে,
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে!

এই জগৎ যেমন বহমান চলমান, এই জগতের যিনি স্বামী তাঁহাকেও কবি নিশ্চল নির্ব্বিকল্প নিগুর্ণ ঈশ্বর করিয়া ভাবেন নাই। লোকলোকান্তর জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীব-অভিব্যক্তির যে যাত্রাপথ বাহিয়া আমাদের প্রত্যেকের জীবনখানি পূর্ণ পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, সেই পথেই যিনি সকল পথের অবসান, যিনি পরম পরিণাম, তিনি সঙ্গীরূপে পথিকরূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতেছেন। কবির জীবনে জীবনে এই লীলা করিবার জন্য তিনিও বাহির হইয়াছেন। "আমার মিলন লাগি তুমি আস্‌ছ কবে থেকে?"—সে কোন্ অনাদিকাল হইতে যে তিনি বাহির হইয়াছেন, তাহা কে জানে! সেই জন্যই তো এই পরিচিত

জগদ্দৃশ্যের মধ্যে সেই অদৃশ্যের ছায়া পড়ে—"O world invisible, we view thee!"

একদিন ভরা শ্রাবণের প্রভাতে যখন রাত্রির মত সমস্ত নিস্তব্ধ, যখন কাননভূমি কুজনহীন এবং ঘরে ঘরে সকল দ্বার রুদ্ধ, তখন সেই নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ বর্ষাপ্রভাতের জনশূন্য পথে চকিতের মত সেই অনাদিকালযাত্রী একক পথিকের ক্ষণিক দর্শন মিলিয়া যায়—

> কূজনহীন কাননভূমি,
> দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
> একেলা কোন্ পথিক তুমি
> পথিকহীন পথের পরে।

এমনি করিয়াই ক্ষণে ক্ষণে কত দৃশ্যে কত গন্ধে কত রসে সেই অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় পরমরসকে বারম্বার পাওয়া গিয়াছে—

> বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্ব রাজন্
> অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
> কত শুভদিনে; কত মুহূর্ত্তের পরে
> অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ!

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের, পরামাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য স্থির ও ধ্রুব হইয়া আছে এবং ইহাদের মধ্যে বস্তুতই কোন দ্বৈত নাই। কবির কাছে এই বৈদান্তিক মতের কোন অর্থ নাই। কারণ জগতের সমস্ত রূপরূপান্তর এবং মানবজীবনের সমস্ত পরিবর্ত্তনপরম্পরাকে 'মায়া' বলিয়া উড়াইয়া

দিয়া একটি নিশ্চল শূন্য এককে একমাত্র করিবার একান্ত চেষ্টা করিলেও, মায়া কোন মতেই দূর হইবার নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলনের মধ্যে যে একটি চিরবিরহ আছে, এই মায়াই যে উভয়ের মধ্যে সেই বিরহের ব্যবধান রচনা করিয়াছে। ইহাতেই তো মিলনের সার্থকতা। নহিলে মিলন যে আছে এ কথাটাই কে অনুভব করিত ?

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধরে' কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় বেদনা, তাহা এই বিরহেরই বেদনা। গ্রহতারার অনিমেষ দৃষ্টির মধ্যে সেই বিরহের চিরব্যাকুলতা। মানব-প্রেমের ও বাসনার সকল অতৃপ্তির মধ্যে সেই অনাদিবিরহের বেদনা। এই বিরহই রূপ ধরিতেছে বলিয়া রূপ ক্রমাগতই "flowing and changing" বহমান এবং পরিবর্ত্তমান।

গীতিমাল্যের একটি কবিতায় এই মায়ার তত্ত্ব বড় চমৎকার করিয়া কবি ব্যক্ত করিয়াছেন—

আমি আমায় করব বড়
এই ত আমার মায়া ;—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেল্‌ব রঙীন্ ছায়া।

তুমি তোমায় রাখ্‌বে দূরে
ডাক্‌বে তারে নানা স্বরে
আপনারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া।

কবি বলিতেছেন, এই যে আমি নিজেকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতেছি, ইহাই তো মায়া! কিন্তু এই মায়াটি যদি না থাকিত, তবে কি আমাদের কান্নাহাসি, আশা ভয় এমন নানা রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিত—তবে যে বিচিত্রতার কোথাও কোন স্থানই থাকিত না। এই তাঁতে আমাতে যে আড়াল রহিয়াছে, তাহাতেই তো "দিবানিশির তুলি দিয়ে হাজার ছবি আঁকা" হইতেছে—এই মায়ার পর্দ্দাখানি না থাকিলে কি এত রং, এত আঁকা বাঁকা কিছুই থাকিত—বর্ণ ও আকার লোপ পাইয়া সমস্তই একমাত্র অখণ্ড এক হইয়া যাইত না? ভাগ্যে এই মায়া ছিল, নহিলে ঈশ্বরেরই বা আপনাতে আপনি থাকিয়া কি আনন্দ ছিল, এবং আমাদেরই বা অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কি আনন্দ ছিল?

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

মায়ার আড়ালে সসীম ও অসীমের এই খেলাটাই সমস্ত জগতের খেলা, সৃষ্টির খেলা, আমাদের জীবনের খেলা বলিয়া সসীম

ক্রমাগতই অসীমে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে এবং অসীম ক্রমাগতই সসীম রূপে আপনাকে ধরা দিতেছে। আমাদের জীবনের পথে যেমন আমাদের জীবন "প্রতিপদেই উৎসুক, অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে," সেইরূপ সেই পথের যিনি চিরসঙ্গী তাঁহারও রূপের অন্ত নাই। ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি। সন্ধ্যার গভীর ছায়াগহন নদীর ঘাটে কোন্ "অজানার বীণাধ্বনি" বাজে, ঝড়ের রুদ্র মাতনির মধ্যে "মেঘের জটা" উড়াইয়া কাহার অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়, "প্রভাতের আলোর ধারায়" কাহার একটি নতমুখ মুখের উপর প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঋতুতে ঋতুতে সেই চিরন্তন পথিক কত নব নব রঙীন্ বেশে দেখা দেয়। শুধুই কি তাহার মনোহরণ বেশ! প্রভাতে শুধু "অরুণবরণ পারিজাত লয়ে হাতে" সোনার রথে চড়িয়া বাতায়নের কাছে একটি বার আসিয়া ঘরের অন্ধকারকে আনন্দে কম্পিত করিয়াই কি সে চলিয়া যায়? তাহার ঝড়ের বেশ। তাহার মৃত্যুর বেশ। জীবনের সকল রূপের মধ্যেই সেই অপরূপের লীলা।

(৩)

আমরা দেখিলাম যে, গীতাঞ্জলির হিরণ্ময় পাত্রখানি অতীন্দ্রিয় লোকের অনির্ব্বচনীয় রসে পূর্য্যমান এবং ইয়েট্স্, টম্পসন্ প্রভৃতি আধুনিক কোন কবির কাব্যের পেয়ালা সেই রসে এমন ভরপূর নহে বলিয়া গীতাঞ্জলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া আদৃত হইয়াছে। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে যদি কেবলমাত্র দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের

মাঝখানের পর্দাটি তুলিয়া ধরা হইত এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপরে সেই অতীন্দ্রিয় জগতের অপরূপ আলো পড়িয়া সকল রূপরস সকল শব্দগন্ধকে যে কি অনির্ব্বচনীয় বেদনায় ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে, যদি গানে কবি তাহারই আভাস মাত্র দিতেন—তবে কাব্য হিসাবে ইহা অতুলনীয় হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে শুধু উপলব্ধির কথা তো নাই—কেমন করিয়া সেই উপলব্ধি সম্ভাবনীয় হইল তাহার 'সাধনার' ইতিবৃত্তও আছে। কাব্য হিসাবে এই সাধনার ইঙ্গিতসম্বলিত কবিতাগুলি নিকৃষ্ট—ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় কবি আঁদ্রে গিদ্ এইরূপ কোন কোন কবিতাকে নৈতিক কবিতা বলিয়াছেন দেখিলাম।

ইংরেজী গীতাঞ্জলি নৈবেদ্য হইতে গীতিমাল্য পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যগুলি হইতে অবচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাপুষ্পের সাজি—সুতরাং তাহার কোন কোন কবিতা সম্বন্ধেই যদি গিদেরএ কথা মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে কেবল মাত্র বাংলা গীতাঞ্জলি পাঠ করিলে এ কথা তাঁহার পুনঃপুনঃই মনে হইত। বাংলা গীতাঞ্জলির গানগুলিতে কবির অধ্যাত্ম "সাধনার"র বার্ত্তার ভাগই বেশি; পরিপূর্ণ উপলব্ধির বাণীর ভাগ কম।

বাংলা "গীতাঞ্জলি"র যে সকল গানে কবির অধ্যাত্ম সাধনার আভাস ইঙ্গিত আছে সেগুলি পরে পরে সাজাইলে কবির সাধনার একটি সুস্পষ্ট চেহারা ধরিতে পারা যায়। মোটামুটি সাধনার তিনটি ধারা আমি ধরিতে পারিয়াছি; যথা—

১। সংসারের দুঃখ আঘাত বেদনার একটি বিশেষ সার্থকতা

আছে। ইহারা তাঁহার "দূতী"; তিনি যে আমাদের জন্য অভিসারে বাহির হইয়াছেন ইহারাই সেই সংবাদ জানায়। আমাদের চিত্ত যখন অসাড় থাকে, তখন এই দুঃখ আঘাতই তো তাঁহার স্পর্শ, তিনিই আমাদের জাগাইয়া দেন। ধূপকে না পোড়াইলে সে যেমন গন্ধ দেয় না, দুঃখের আঘাত ভিন্ন আমাদের জীবনের পূজা তাঁহার দিকে উচ্ছ্বসিত হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন "আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।" এই ব্যথার গানই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি।

২। "সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে!" অহঙ্কারের বাঁধন যতক্ষণ প্রবল, ততক্ষণ বিশ্বের সকলের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলন হইতেই পারেনা—কারণ অহঙ্কার "সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে আপনাকে যে বাজাতে চায়।"

গীতিমাল্যের একটী গান আছে—

বেসুর বাজে রে
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন মাঝেরে!

এই অহঙ্কারের মধ্যেই সমস্ত বেসুর,—এই খানে বিশ্ব প্রতিদিন প্রতিহত, আনন্দ সংকীর্ণ, প্রেম সঙ্কুচিত। এই অহংটিকে তাঁহার পায়ে বিসর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত আমাদের শান্তি নাই।

৩। এ দেশের "সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে" অপমানের তলায় ভগবানের চরণ নামিয়াছে—সেই খানে

তাঁহাকে প্রণাম না করিলে তাঁহাকে প্রণাম করাই হইবে না। সেই খানে তাহাদের সঙ্গে এক না হইলে "মৃত্যু মাঝে হ'তে হবে চিতাভস্মে সবার সমান"—সেই বড় যাত্রায়, সে সকল মানুষের মধ্যে ভিড়ের মধ্যে কর্ম্মযোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, তবেই মুক্তি। কারণ

> তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
> করছে চাষা চাষ,
> পাথর ভেঙে কাট্‌চে যেথায় পথ
> খাট্‌চে বারো মাস।

বাংলা "গীতাঞ্জলিতে" কবির সাধনার ধারার এইরূপ সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, গীতাঞ্জলিতে যে-সকল কবিতায় সাধনার সফলতার মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারা যে কত সত্য তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু সচরাচর আর্টিষ্টের কাছে আমরা তাহার সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলটাই পাই, কেমন করিয়া সে ফল ফলিল সে সংবাদ চাপা থাকে। কারণ, পাকশালায় রন্ধনের সামগ্রী যখন স্তূপীকৃত, তখন তাহাতে কোন আনন্দ নাই; কিন্তু যখন অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়, তখনই ভোজের প্রকৃত আনন্দ। "গীতাঞ্জলি"র এই সাধনার কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। এ যেন কবির প্রতিদিনের ডায়ারী—শুধু প্রভেদ এই যে মানুষ ডায়ারী

লিখিবার কালে প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু সচেতন না হইয়া পারে না। এই কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের স্পর্শে তাঁহার অপূর্ব্ব পুলক, তাঁহার অপেক্ষা ও আশা, আপনার সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব, প্রবল দুঃখ ও আঘাতের মধ্য দিয়া কেবলি জাগরণ, তাঁহার সুদূর পরিণামের দৃষ্টি—সমস্তই স্তরে স্তরে পত্রে পত্রে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। শিল্পীর মত কেবল শিল্পের শ্রেষ্ঠ ফল দান করিয়া কবি বিদায় লন নাই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া দান করিয়াছেন। এইখানেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই পশ্চিমে এই শ্রেণীর অন্যান্য সকল কাব্যের অপেক্ষা গীতাঞ্জলির সমাদর এত অধিক হইয়াছে। এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কবির সাধনা গিয়া আঘাত করিতেছে। আমার যতদূর মনে পড়ে ইংরেজী গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে একখানি পত্রে প্রবীণ সাহিত্যিক ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক এই কথাটিই বলিয়াছিলেন।

কিন্তু কবির অধ্যাত্ম 'সাধনা'র কথা মানুষের যতই উপকার সাধন করুক, তাহা সেই "আঘাত করা বোঁটাতে"—তাহা "ফুল ফোটানো" নহে। একজনের সাধনা আর একজনের জীবনকে সাহায্য করিতে পারে বটে, কিন্তু সাধনা নিজেই যখন কূলে উত্তীর্ণ হয় নাই, তখন তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে, যে ব্যক্তি নির্ভর দেয় এবং যে ব্যক্তি নির্ভর করে উভয়কেই ডুবিতে হয়! সকল দেশেই গুরুবাদ এইজন্য অন্ধ অনুকরণেরই সৃষ্টি করিয়াছে।

কারণ কোন একজন মানুষের পন্থা আর একজনের পন্থার সমান নহে। যে যে-পন্থা দিয়াই যাউক, গম্যস্থানে পৌছিয়া সেখানকার কথা বলিলে আর ভয় নাই,—কারণ সেখানকার আনন্দের হিল্লোল তখন সকল বিচিত্র পথের মধ্যেই সমান হিল্লোলিত হইবে। আমাদের দেশের লোক সাধনার বিচিত্রতাকে—"Varieties of Religious Experience"কে—উইলিয়ম জেম্‌সের মত বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক —একটি বিষয়ে এদেশের লোকের বোধ সুপরিণত হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনার ফলটিতে ঠিক পাক ধরিল কিনা, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি। কথায় আমাদের চিড়া ভিজাইতে পারে না। আমাদের দেশের লোক শ্রুতিধারণের মত করিয়া যে-সকল ভক্তদের বাণী ও সঙ্গীত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা শ্রবণমাত্র আমরা এ বিষয়ে আমাদের জাতির প্রতিভা বুঝিতে পারিব। ভক্তির সঙ্গে ভেক এদেশে মিশিয়া আছে সত্য; কিন্তু কালের চালুনিতে ভেকের রচনা তলায় থিতাইতেছে কই।

আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনবৃক্ষের পরিণামের দিকে চাহিয়া আছি; একটা "গীতাঞ্জলি"কেই আমরা সেই জীবন-মহাবৃক্ষের পরিণত ফল বলিতে যাইব কেন? গীতাঞ্জলিকে পশ্চিম বেশি বুঝিয়াছে, একথা তাহারা গর্ব্ব করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেও আমরা তাহা সত্য নয় জানি। যথার্থ বোধ জনসংখ্যার আধিক্যের উপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর কোন কবিকেই বহুলোকে বুঝে নাই। আমরা যে কবিকে তাঁহার

সমগ্র কাব্যজীবনের ভিতর হইতে দেখিতেছি—তাঁহার জীবনের পশ্চাতে যে বহুযুগের অধ্যাত্ম রসধারা তাঁহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে তাহাকে দেখিতেছি,—কিছুই আমাদের কাছে ঝাপসা নহে। আমরা জানি তাঁহার প্রাণের মূল জীবনের সুখদুঃখময় সকল বিচিত্র রসের মধ্যে কত দূরে গভীরতম তন্তুতে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত বিশ্বের আলোকে সমীরণে নানা আঘাতে বিকাশ লাভ করিয়া দিকে দিকে সেই বিচিত্র জীবনের রসপুষ্ট কাব্যের শাখাপ্রশাখা কি আশ্চর্য্য পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ক্রমে যখন শাখাগ্রভাগে পরিণত জীবনের ফল ধরিল, তখন তাহার কাঁচা রং আমরা দেখিয়াছি—তখনও তাহা রসে মধুর হয় নাই, জীবনের ভোগের বৃন্তে তাহার জোড় দৃঢ়বদ্ধ। ক্রমে ভিতরে ভিতরে রসে যখন সে পূর্ণ হইতে লাগিল, তাহার ভিতরের সেই পূর্ণতা তাহার বাহিরে আত্মদানরূপে অত্যন্ত অনায়াসে যখন প্রকাশ পাইল, তাহার ভোগের বৃন্ত শিথিল হইল—তখন তাহার সেই বিশ্বের কাছে নিবেদিত অঞ্জলিকে আমরা যে চিনি নাই, একথা স্বীকার করিনা। কিন্তু সেই অঞ্জলিকেই সম্পূর্ণ বলিতে যাইব কেন? সে তো রসের ভারে একেবারে অবনত হয় নাই—তাহার রসের কথার চেয়ে তাহার সাধনার কথা তাহার বেদনার কথা যে অধিক। এই নবপ্রকাশিত গীতিমাল্যের গানগুলি রসে টুস্‌টুসে ফলের মত —স্পর্শমাত্রেই যেন ফাটিয়া পড়িবে। ইহার মধ্যে সাধনার বিশেষ কোন বার্ত্তা নাই—সেইজন্য বেদনার মেঘ-মলিনিমা নাই।

গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্য এই দুই নামের মধ্যেই দুই কাব্যের পার্থক্য দিব্য সূচিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলি যেন দেবতার পায়ে সসম্ভ্রমে গীতি-নিবেদন—সেখানে "দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, বন্ধু ব'লে দুহাত ধরিনে।" গীতিমাল্য বঁধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহার। দূরত্বের বাধা দূর হইয়া অত্যন্ত নিকট নিবিড় পরিচয়।

> বঁধুর কাছে আসার বেলায়
> গানটি শুধু নিলেম গলায়
> তারি গলার মাল্য ক'রে
> করব মূল্যবান!

গীতিমাল্য

(১)

ইংরেজী গীতাঞ্জলির যতগুলি সমালোচনা বিলাতী কাগজে পড়িয়াছি তাহার অধিকাংশেরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে "মিষ্টিক" বা মরমী কবি মনে করার জন্য মিষ্টিক সাহিত্যের সহিত তাঁহার কাব্যের সৌসাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বিলাতী সমালোচকেরা খৃষ্টান্ ভক্তি-সাহিত্যের সঙ্গে গীতাঞ্জলির তুলনা করিয়াছেন ; কেহ কেহ বা হিব্রু সামগাথা, ডেভিড্ আইজায়া প্রভৃতি ভক্তদের বাণীর সহিত তাঁহার কাব্যের সারূপ্য ঘোষণা করিয়াছেন। জলালুদ্দিন রুমি প্রভৃতি দু একজন সুফী কবির নাম পশ্চিমে বিখ্যাত হইয়াছে ; সুফী কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া কোন কোন সমালোচক গীতাঞ্জলির প্রসঙ্গে সুফী কবিদের রচনা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথকে 'মিষ্টিক' উপাধিতে ভূষিত করা ও মিষ্টিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের সৌসাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করাটা ইংরেজ সমালোচকের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র হয় নাই। এক সময় ছিল যখন নাটক লিখিলেই লোকে শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে তুলনা করিত। এখন দেখিতে পাইয়াছে যে, শেক্সপীয়রের নাটকই নাটকের একমাত্র রূপ নয়। শেলির প্রমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড বা চেঞ্চিও নাটক; ব্রাউনিংয়ের প্যারাসেল্‌সাস্ বা পিপা পাসেস্‌ও নাটক; আবার ইয়েট্‌সের শ্যাডোয়ি ওয়াটারস্, মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড, বার্নাড শ'র ম্যান এণ্ড সুপারম্যান্ এবং ইব্‌সেনের পিয়ার গিণ্টও নাটক। নাটক ও খণ্ডকাব্যের রূপ ক্রমশই বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর হইতেছে। অধ্যাত্ম কাব্যের রূপও যে খৃষ্টান্ ভক্তবাণী বা হিব্রু সামগাথা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে, এ ধারণা ইউরোপীয়দিগের মনে এখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। কারণ খৃষ্টানধর্ম্ম ছাড়া জগতে আর কোথাও যে ভক্তিধর্ম্ম থাকিতে পারে, সে দেশের নানাশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত লোকেরও মনে এ বিশ্বাস নাই। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনরীগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বাইবেলের ভক্তিবাদ শ্রবণ করিয়া এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে। কবীরের বাক্যাবলীর মধ্যে এক জায়গায় আছে যে শব্দ হইতে সমস্তের উৎপত্তি, সকলের আদিতে শব্দ ছিল—তাহা পাঠ করিয়া কোন

বিখ্যাত ইংরেজ বিদুষীর মনে হইয়াছিল যে কবীর সেণ্টজনের সুসমাচার হইতে নিশ্চয়ই ঐ ভাবটি ধার করিয়াছেন!

যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথকে খৃষ্টান ভক্ত কবিদের সঙ্গে তুলনা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। খৃষ্টান ধর্ম্ম ভক্তিধর্ম্ম হইলেও প্রাচীন হিব্রু ধর্ম্মের বহু সংস্কারকে সম্পূর্ণ রূপে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এই জগৎ যে জগদীশ্বরের দ্বারা আবাস্য নহে, তিনি যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা-রূপে ইহার অন্তরতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত নাই—হিব্রুধর্ম্মের ইহা এক মূল কথা। জগৎপতি থাকেন এক কল্পিত স্বর্গলোকে এবং এই জগৎ যন্ত্র তাঁহার 'হস্তের' দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাপী মনুষ্যের আবাসস্থান হইয়া আছে। যদিচ খৃষ্ট মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং স্বর্গে পুনরায় লইয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে মানবরূপ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের ব্যবধান তাঁহার দ্বারা দূরীভূত হয় নাই। তিনি মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে তাঁহাকে ক্রুশের ব্যথা বহন করিতে হইয়াছিল। সেই ক্রুশ তাঁহার সকল ভক্তের জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন—সেই পরম দুঃখ স্বীকারের উপর স্বর্গের অধিকারলাভের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে। মানবের নিকটে ঈশ্বরের আত্মদান আনন্দের আত্মদান নহে, দুঃখের বলিদান—এই তত্ত্ব কোথায়, আর কোথায় উপনিষদের আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ হইতে সকল

সৃষ্টির উদ্ভব—এই তত্ত্ব!—আমাদের শাস্ত্রে বলে জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের আনন্দের একাত্মযোগ—জগৎ ঈশ্বরের আনন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ। জগৎ সসীম, ঈশ্বর অসীম, কিন্তু সসীমের মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই জগৎ তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এ তত্ত্ব খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। সেইজন্য সসীম-অসীমের দ্বন্দ্ব সে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে।

রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত—খৃষ্টীয় স্বর্গমর্ত্তের কল্পিত ব্যবধানের তত্ত্ব, মনুষ্যের আদিম পাপের তত্ত্ব এবং খৃষ্টের আত্মবলিদানের দ্বারা সেই পাপ হইতে উদ্ধারের তত্ত্ব তাঁহার কাছে অত্যন্ত স্থূল ও ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি প্রতিপন্ন হইতে পারে? সেইজন্য তাঁহাকে সেণ্টফ্রান্সিস্ অব্ অ্যাসিসি বা ঐ শ্রেণীর খৃষ্টীয় সাধকদিগের সঙ্গে তুলনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। উপনিষদের সঙ্গে বাইবেলের যেমন তুলনা চলে না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্রান্সিস্ অব্ অ্যাসিসি বা মঠাশ্রয়ী খৃষ্টীয় কোন সাধকের তেমনিই তুলনা চলে না।

আমি অবশ্য ভুলি নাই যে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও প্লটিনাসের ভাববাদ যেখানেই খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে তত্ত্বে এবং সাধনায় মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, সেখানেই খৃষ্টান ধর্ম্মতত্ত্ব এবং সাধনা এমন একটি অভাবনীয় রূপ লাভ করিয়াছে যাহা বাস্তবিকই বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া পারে না। খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বরের সসীম ও অসীম স্বরূপের যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে—ঈশ্বর তাঁহার শক্তিতে

অনন্ত, কিন্তু প্রেমে সান্ত এই যে তাঁহার দ্বৈত খৃষ্টধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে,—ইহাকে অবলম্বন করিয়া এক নিগূঢ় তত্ত্বের উদ্ভব জর্ম্মাণ দেশে ঘটিয়াছে। জেকব্ বইমে, এই তত্ত্বের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতা। জেকব বইমে, রুইজব্রোয়েক প্রভৃতি কোন কোন সাধকের সহিত আমাদের প্রাচ্য ভক্তি-সাধকদিগের সৌসাদৃশ্য এইজন্য দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর খৃষ্টীয় সাধনা বলিতে উৎকট পাপবোধ ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা এবং মানবরূপী ভগবান্ খৃষ্টের অনন্য শরণাগতির চিত্রই মনে জাগে। তাহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সাধনার সম্বন্ধ বড়ই

উপনিষদের স্তন্যরসে রবীন্দ্রনাথ বর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যের মর্ম্মস্থলে উপনিষদের তত্ত্ব বিরাজমান একথা বলিলেও কেবলমাত্র উপনিষদ 'গীতিমাল্যে'র গানগুলির উৎস হইতে পারিত না। উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাব—আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন। "শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত" হইয়া সাধক আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।—জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে ধ্যায়মান হইয়া মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায়। উপনিষদ যেখানে সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখিবার কথা বলিয়াছেন, সেখানেও আত্মস্থ হইয়া যোগস্থ হইয়া নিত্যোঽনিত্যানাং সকল অনিত্যের মধ্যে তাঁহাকে নিত্যরূপে ধ্যান করিবার উপদেশই দিয়াছেন।

উপনিষদের সাধনা এই অন্তর্মুখীন্ ধ্যানপরায়ণ সাধনা—অধ্যাত্ম যোগের সাধনা। উপনিষদের ব্রহ্ম—দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং। তিনি লীলারসময় বিশ্বরূপ ভগবান্ নহেন। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের আভাস উপনিষদের মধ্যে নানাস্থানে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে পরিস্ফুট আকার লাভ করিয়াছে একথা কোন মতেই বলা যায় না। লীলাতত্ত্বের কথা এই যে, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল বস্তু, সকল বৈচিত্র্য, মানবজীবনের সকল ঘটনা, সকল উত্থান পতন, সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু—সমস্তই শ্রীভগবানের রসলীলা বলিয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। ভগবান অনাদি অনন্ত নির্ব্বিকল্প হইয়াও প্রেমে অন্তের মধ্যে ধরা দিয়াছেন; সেইজন্যই তো কোথাও অন্তের আর অন্ত পাওয়া যায় না। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" সকল সীমাকে রন্ধ্র করিয়া সেই অনন্তের বাঁশী তাই নিরন্তর বাজিতেছে এবং তিনি বারবার জীবনের নানা গোপন নিগূঢ় পথ দিয়া আমাদিগকে তাঁহার দিকে কত দুঃখক্লেশ, কত আঘাত-অভিঘাতের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সমস্ত জীবনের এই সুখদুঃখবিচিত্র পথ তাঁহারি অভিসারের পথ। এই পথেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলন; এই পথেই কত বিচিত্র রূপ ধরিয়া তিনি দেখা দিতেছেন। এই যে বিশ্ব ও মানবজীবনের সকল বৈচিত্র্যকে ভগবানের প্রেমের লীলা বলিয়া অনুভূতি, বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের ইহাই সার কথা।

উপনিষদের যোগতত্ত্বে বেদান্ত শাস্ত্র তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে কাব্যকলা সমুৎসারিত হয় না। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বে অনুভূতির বিচিত্রতা ও প্রসার এমন বাড়িয়া যায়, যে কাব্যক লাকে আশ্রয় করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। এইজন্য উপনিষদ হইতে আমরা দর্শন শাস্ত্র পাইয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদ হইতে কেবল দর্শন-শাস্ত্র নহে, অপূর্ব্ব ভক্তি কাব্য সকলও সম্ভাবিত হইয়াছে। কেবল বাংলাদেশের বৈষ্ণব কবিতার কথা বলিতেছি না, উত্তর-পশ্চিমের কাব্য ও গানগুলিও সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে এবং রসগভীরতায় বাংলার বৈষ্ণব কাব্যের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা সে সকল কাব্য ও গানের কত অল্প পরিচয় পাইয়াছি। জ্ঞানদাস, রবিদাস, কবীর, দাদু, মীরাবাই প্রভৃতি ভক্ত কবিদের গানের যে দু-একটা টুক্‌রা কালের স্রোতে এখনকার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে, তাহা শতদলের ছিন্ন পল্লবের মত সুগন্ধে প্রাণকে বিধুর করিয়া দেয়। মানুষের অন্তরের ভক্তি যখন তাহার অনুরূপ ভাষা লাভ করিয়া আপনাকে ব্যক্ত করে, তখন সে যে কি অপূর্ব্ব জিনিস হয় তাহা এই উত্তরপশ্চিমের ভক্তিসাহিত্যে পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন্ এবং কেবলমাত্র বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের দ্বারাও অনুপ্রাণিত নন্। এই দুই তত্ত্বই তাঁহার জীবনের সাধনায় জৈব মিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ নূতন রূপ পরিগ্রহ

করিয়াছে। তাঁহার ভক্তিকাব্যের এই নবরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার কি পরিমাণ অংশ উপনিষদের এবং কি পরিমাণ অংশ বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের—তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। কারণ এতো দর্শনশাস্ত্র নয়—এযে জীবনের জিনিস। এ গান যে জীবন হইতে প্রতিফলিত হইতেছে। সে জীবন আপনার অধ্যাত্ম পিপাসায় কোন রসকেই বাদ্ দেয় নাই—তাহার মধ্যে সকল বিচিত্র রস মিলিয়া জুলিয়া এক অভিনব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্য বৈষ্ণবকাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বা গীতিমাল্যের তুলনাই চলে না। ঐ কাব্য দুটির মধ্যে যে বৈষ্ণব ভাব বহুল পরিমাণে নাই এমন কথা বলি না; কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে যাহা বৈষ্ণবভাব নয়, যাহা বৈষ্ণব ভাবাবলীর সঙ্গে সঙ্গত হইয়া তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছে।

আরও একটি কারণে রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব বা ভক্ত কবিদিগের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কেবল যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব মিলিয়াছে এবং বাণীরূপ লাভ করিয়াছে তাহা নহে। কবীর, দাদু প্রভৃতির মধ্যেও এই একই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সুফীধর্ম্ম, বেদান্ত এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এই ত্রিবেণীসঙ্গমের তীর্থোদকে কবীরের অমর সঙ্গীত অভিষিক্ত হইয়াছে। সেইজন্য তাহার অন্তরে যেমন কঠিন একটি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাধার, তাহার উপরে তেমনি ভক্তির রসোচ্ছ্বাস সঙ্গীতের তরলধারায়

নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেই সকল গানের সহিত গীতিমাল্যের গানের রূপভেদ আছে। 'গীতিমাল্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথ যে 'সোনারতরী' 'চিত্রা' 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা'রও রবীন্দ্রনাথ—যিনি প্রকৃতির কবি, মানবপ্রেমের কবি, যিনি সকল বিচিত্ররসনিগূঢ় জীবনের গান গাহিয়াছেন, তিনিই যে এখন রসাণাং রসতমঃ, সকল রসের রসতম ভগবৎ প্রেমের গান গাহিতেছেন—ইহাতেই ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের ভক্তিসঙ্গীতের সঙ্গে এই নূতন ভক্তিসঙ্গীতের প্রভেদ ঘটিয়াছে। এমন ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটিয়াছে কিনা জানিনা। কারণ, ধর্ম্ম চিরকালই জীবনের অন্যান্য বৈচিত্র্য হইতে আপনাকে সরাইয়া সরাইয়া লইয়া সযত্নে সন্তর্পণে আপনাকে এককোণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জীবনের গতি একদিকে, ধর্ম্মের গতি অন্যদিকে—জীবনের গতি প্রবৃত্তির দিকে, ধর্ম্মের গতি নিবৃত্তির দিকে। সেইজন্য কবি ও ভগবদ্ভক্ত—এ দুয়ের সম্মিলন দেখা যায় নাই। ভগবদ্ভক্ত হয়ত কবি হইয়াছেন—অর্থাৎ ভক্তির গান লিখিয়াছেন—কিন্তু জীবনের অন্যান্য রসের প্রকাশ তাঁহার মধ্যে ফুটিয়াছে কোথায়? পক্ষান্তরে কোন কবি যে ভক্তির গান লিখিয়া অমর হইয়াছেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না। কবীর বা দাদু বা আর কোন ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথের মত প্রণয়কবিতা বা প্রণয়সঙ্গীত লিখিয়াছেন, ইহা কোনদিন যদি কোন ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াও দেন, তাহা হইলেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব না। কোন

পুরাণো পুঁথির মধ্যে কবীরের লিখিত গানের এমন ছত্র বাহির হওয়া অসম্ভব :—

"ভালবেসে, সখি, নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখিয়ো
তোমার মনের মন্দিরে !"

কিম্বা "সখি প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে ?
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে !"

জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতার এমন অবাধ এমন আশ্চর্য্য প্রকাশ জগতের অল্প কবিরই মধ্যে দেখা গিয়াছে। পরিপূর্ণ জীবনের গান যিনি গাহিয়াছেন, তিনি যখন অধ্যাত্মউপলব্ধির গান গাহেন, তখন এস্‌রাজের মূল তারের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশাপাশি যে তারগুলি থাকে তাহারা যেমন একই অনুরণনে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে এবং মূল তারের সঙ্গীতকে গভীরতর করিয়া দেয়, সেইরূপ অধ্যাত্মউপলব্ধির সুরের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য রসোপলব্ধির সুর মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়তার সৃষ্টি করে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে যে সকল বিলাতী সমালোচক খৃষ্টান ভক্তকবিদের সঙ্গে বা হিব্রু প্রফেটদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনা যেমন সত্য হয় নাই, সেইরূপ যাঁহারা এতদ্দেশীয় ভক্ত কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করেন, তাঁহাদেরও তুলনা ঠিক বলিয়া মনে করি না। বরং আধুনিক কালের যে সকল কবি জীবনের সকল বিচিত্রতার রসানুভূতিকে অধ্যাত্মরসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে চান্—সেই সকল কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় হইতে

পারেন। ওয়াল্ট হুইটম্যান, রবার্ট ব্রাউনিং, এড্ওয়ার্ড কার্পেণ্টার, উইলিয়ম ব্লেক্, ফ্রান্সিস্ টম্প্সন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাব্যজীবনধারার সঙ্গে বরং রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন-ধারার তুলনা করিয়া অধ্যাত্মরসবোধের বিকাশ কোন্ কবির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ব্রাউনিংএর শেষ বয়সের ধর্ম্মকাব্য Ferishtah's Fancies, ওয়াল্টের Sands at Seventy, কার্পেণ্টারের Towards Democracy এবং টম্প্সনের The Hound of Heaven প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বা গীতিমাল্যের তুলনা করিলে এই শ্রেণীর ধর্ম্মকাব্যে এই সকল কবির মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই অনুমিত হইবে।

আমার হাতের কাছে এই কাব্যগুলি নাই—কেবল টম্প্সনের The Hound of Heavenএর শেষ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"All which I took from I did but take,
Not for thy harms,
But just that thou might'st seek it in My arms.
All which thy child's mistake
Fancies as lost, I have stored for thee at home,
Rise, clasp my hand, and come."
Halts by me that foot-fall ;
Is my gloom after all
Shade of His hand, outstretched caressingly ?

"লয়েছিনু যাহা কাড়ি
আমি, লই নাই তাহা ক্ষতির লাগি—
ভেবেছিনু তুমি এসে
মোর হাত হ'তে নিজে লইবে মাগি।
অবুঝ শিশুর মত
মনে ভেবেছিলে যাহা হারায়ে গেছে
জমিয়ে রেখেছি তাহা
দেখ, তোমারি লাগিয়া ঘরের মাঝে!
উঠ, ধর হাত, এসহে কাছে!"
থেমে গেল পদধ্বনি।
হায়, আমার মনের আঁধার রাশি—
সেকি তাঁর করচ্ছায়া?
তিনি, আদরের লাগি বাড়ান্ হাসি?

ইহার জুড়ি কবিতা গীতিমাল্যে আছে :—

এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে?
হাসিতে আকাশ ভরিলে॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাখে যাহা কিছু পায়
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে॥
ভেবেছিল চির কাঙাল সে এই ভুবনে
কাঙাল মরণে জীবনে।

ওগো মহারাজা, বড় ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল তোমার আলয়ে
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে ॥

এই উদ্ধৃত ছোট গানটির মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম অবস্থায় ত্যাগের রিক্ততার সুগভীর বেদনা এবং শেষ অবস্থায় ভগবানকে অনন্যশরণ জানিয়া আশ্রয় করিবামাত্র মিলনের অপূর্ব্ব আনন্দের সমস্ত ইতিহাস কি একটি সংহতরূপ লাভ করিয়াছে! টম্পসন্ The Huond of Heavenএ এই ইতিহাসকেই কত ফলাও করিয়া স্তরে স্তরে উদ্ঘাটন করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা আশ্চর্য্য হইলেও গীতিমাল্যের এই গানের কলাসংযম তাহাতে লক্ষিত হয় না।

গীতিমাল্যের গোড়ার দিকে নয়টি কবিতা আছে। এবং ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই একই সময়ে রচিত গোটা পনেরো গানও আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু জানা দরকার হয়। পৃথিবীতে বোধ

হয় আর কোন কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে এমন একান্ত-ভাবে অনুসরণ করিয়া চলে নাই। কবির জীবনের বড় বড় পরিবর্ত্তনগুলি প্রথমে কাব্যের মধ্য দিয়া নিগূঢ় ইঙ্গিতমাত্রে প্রতিফলিত হইয়া শেষে জীবনের ঘটনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে অধুনা মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় Subliminal consciousness বা মগ্নচৈতন্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিচিত্র তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন ইহার যেরূপ সুস্পষ্ট উদাহরণ এমন বোধ হয় দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। কোন কবির কাব্য যে তাহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্ত্তৃত্বের কোন অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কোন কবির জীবনে ঘটিয়াছে কিনা জানিনা। সেইজন্যই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোচনার সময়ে তাঁহার জীবনের কথা বেশি করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে অনেকে ব্যক্তিগত আলোচনা মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুত ইহা তাহা নহে।

কবির কাব্যের সঙ্গে জীবন একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া অন্য মানুষের জীবনে যে সকল ঘটনা অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য, কবির কাছে তাহারা একটি অভূতপূর্ব্ব অসামান্যতা লাভ করিয়া বিস্ময়কর রূপে প্রতীয়মান হয়। দেশভ্রমণের বাসনা আমাদের সকলেরি ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাকে যতটা পারি দেখিয়া লইব, এ সাধ মনের মধ্যে গোপনে গোপনে থাকে, সুযোগ পাইলেই ইহা প্রবল হইয়া চরিতার্থতার

পথ অন্বেষণ করে। কত সময় কত অভাবিতপূর্ব্ব কারণে এরূপ সুযোগ আসিয়াও আসে না—মনের একান্ত ইচ্ছার পূরণ হয় না। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারই কবির কাছে এমন একটি প্রবল ব্যাপার যে তাহা সমস্ত মনকে সমস্ত চৈতন্যকে নাড়া দিয়া কাব্যের মধ্যে একটা অননুভূত ভাবকে জাগাইয়া তোলে এবং জীবনকেও একটা নূতন রহস্যে মণ্ডিত করিয়া দেখে।

কবি যে ইউরোপ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা এমনি একটি অসামান্য ব্যাপার; অকস্মাৎ অজানাদেশে যাত্রার জন্য বিহঙ্গদলকে যেমন এক অশান্ত আবেগ ও চঞ্চলতা মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে প্রবৃত্ত করে, যাত্রার পূর্ব্বে ঠিক তেমনি একটি অকারণ চাঞ্চল্য কবি অনুভব করিতেছিলেন। কেন যাইতেছেন, সেখানে গিয়া কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে—এ সকল কোন প্রশ্নেরই জবাব দেওয়া তাঁহার পক্ষে শক্ত ছিল। যাত্রার যাহা একমাত্র কারণ তাহাতো কবিতায় বহুপূর্ব্বেই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী!

কিন্তু এবারে সে কারণ ছিল না। এবারে কোন কারণ না জানিয়াও তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে এ যাত্রা তাঁহার তীর্থ-যাত্রার মত—এ যাত্রা হইতে তিনি শূন্যহাতে ফিরিবেন না। এবার মহামানবতীর্থের যে শক্তি সমুদ্রমন্থনজাত অমৃত তিনি

সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, তাহাতে তাঁহার কাব্যের ও জীবনের 'মহা অভিষেক হইবে।

তীর্থ যাত্রার জন্য এই ব্যাকুলতা যখন পূর্ণমাত্রায় মনকে অধিকার করিয়া আছে, তখন হঠাৎ স্নায়ুদৌর্ব্বল্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কবির যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল। কবি শিলাইদহ চলিয়া গেলেন। ষষ্ঠ হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ (৬—৩৬) পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে কবিতা ও গানগুলি গীতিমাল্যে স্থান পাইয়াছে তাহারা সেখানে 'আমের বোলের গন্ধে অবশ' মধুমাসে রুগ্ন অবস্থায় রচিত। তখন কাজ কর্ম্ম, দেখা সাক্ষাৎ, সমস্তই বারণ হইয়া গিয়াছে :—

> কোলাহল ত বারণ হ'ল
>
> এবার কথা কানে কানে
>
> এখন হবে প্রাণের আলাপ
>
> কেবলমাত্র গানে গানে

তাই বলিতেছিলাম যে বাহির হইতে দেখিতে গেলে এই এক সামান্য ঘটনার আঘাতে এই নূতন 'প্রাণের আলাপে'র সূত্রপাত হইল।

কিন্তু এই কানে কানে কথা'র রহস্য নিবিড়তাই যে এই সময়ের কবিতা ও গানগুলির বিশেষত্ব তাহা নহে। পৃথিবীর গভীরতম স্তরে যে উৎস জমাট্ হইয়া আছে, তাহার পূর্ণতার তো কোন অভাব নাই ; তথাপি বাহির হইবার বেদনায় তাহার সমস্ত অন্তর যেন ক্রন্দন করিতে থাকে। 'সেইরূপ এই কানে কানে কথা' যখন সব চেয়ে বেশি জমিয়াছে, যখন বিশ্বের

একেবারে মর্ম্মস্থলে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার অবকাশ ঘটিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই তাহাতেই চরম পরিতৃপ্তি হইল না—এই কথাই বারবার নানা রকম সুরে বাজিতে লাগিল :—

"অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে।

*　*　*　*

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর
বড় কঠিন সাধনা, যার
বড় সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে,
বাহির ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।"

*　*　*　*

"এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।"

*　*　*　*

এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আরত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।"

অথচ কবিতাগুলির মধ্যে এই সুর নাই। তাহাদের মধ্যে পরিচিততম অভ্যস্ততম বস্তুর আবরণ উন্মোচিত হইয়া—

"সকল জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিল অজানা যে"—সেই অজানাকে অত্যন্ত

কাছাকাছি, অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধির কথা আছে। নবম সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, এই নদীর পারে, এই বনের ধারে যে সেই 'অজানা' ছিলেন, সে কথা তো কেহই তাহাকে বলে নাই। কখনো কখনো ফুলের বাসে, দখিনে হাওয়ায়, পাতার কাঁপনিতে মনে হইত যেন অত্যন্ত কাছেই তিনি। কিন্তু আজ এই "নয়ন-অবগাহনি" স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়ায় সেই বন্ধুর একি হাসি, একি নীরব চাহনি দেখা দিল! 'লক্ষ তারের বিশ্ব-বীণা,' এই নীরবতায় লীন হইয়া এইখানে আজ সুর কুড়াইতেছে, 'সপ্তলোকের আলোকধারা' এই ছায়াতে আজ লুপ্ত হইয়া যাই-তেছে! একাদশ সংখ্যক কবিতাটি আরও চমৎকার! বিশ্বের একেবারে অন্তরতম কেন্দ্রস্থলে সমস্ত জীবনের সুদীর্ঘ পথখানি গিয়া মিলিয়াছে এবং সেই নিভৃত কেন্দ্রলোকটির গোপন দ্বার সমস্ত "চরাচরের হিয়ার কাছে"ই আছে। এই জীবনপথিকের দীর্ঘ পথযাত্রার সেই খানেই অবসান। সেখানে কে আছে? যে আছে—

> অপূর্ব্ব তার চোখের চাওয়া
> অপূর্ব্ব তার গায়ের হাওয়া
> অপূর্ব্ব তার আসা যাওয়া গোপনে!

সেই 'জগৎ-জোড়া ঘর'টিতে কেবল দুটিমাত্র লোকের ঠাঁই হয়—সেই বিশ্বপদ্মের কেন্দ্রগত মধুকোষে যে অপূর্ব্ব লোকটি বসিয়া আছেন তাঁর এবং সেই কমলমধুপিয়াসী যে চিত্তভ্রমর তাহার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার—কেবলমাত্র এই দুজনার।

এই কবিতাগুলির প্রত্যেকটিতেই সসীম-অসীমের, সরূপ-অরূপের জীব ও ভগবানের নিত্য প্রেমলীলার উপলব্ধির নিবিড় আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ লীলা বিশ্বের সেই নিভৃততম অন্তরতম কেন্দ্রটিতে উদ্‌যাপিত। এ লীলা বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দ, বিশ্বমানবের সকল বিচিত্রতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ছাপাইয়া পড়ে নাই। "সেখানে আর ঠাই নাহিত কিছুরি।" সেইজন্যই ঐ আর একটি সুর আসিয়া এই নিভৃত বিলাসকে ভাঙ্গিয়া দিল—ঐ বাহির হইয়া পড়িবার সুর।

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।

কেবল এই কবিতাগুলির সুর যদি চিত্তকে ভরপুর করিয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে কখনই ঐ বাহির হইয়া পড়িবার সুর এমন প্রবলতা লাভ করিতে পারিত না। কবিতাগুলির সুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সুর—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাতত্ত্বে এই সুরই তো ফুটিয়াছে। সেই তত্ত্বে এই কথাই বলে যে, ভগবান জীবকে ভুলাইবার জন্যই সৌন্দর্য্যের বেশ পরিয়া দেখা দেন, অরূপ হইয়াও রূপ ধরেন, এবং দুঃখের দুর্গম পথের মধ্যদিয়া অভিসারে বিশ্বের অন্তরতম জায়গায় সেই নিভৃত নিকুঞ্জে সকল সংস্কারের পাশ ছিন্ন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনেন :—

আমার পরশ পাবে ব'লে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ ত জানেনা তা।

রইল আকাশ অবাক্ মানি
করল কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।

কিন্তু সে সুরে কুলাইল না। লোহিত সমুদ্রে এই গান জাগিল ঃ—

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ!

"আরো আরো আরো" চাই। কেবল তৃপ্তির বিরতি চাইনা, অতৃপ্তির চিরগতি চাই। কেবল উপলব্ধির শান্তি নয়, নব নব বেদনাময় চৈতন্য।

(৩)

ইংলণ্ডে, ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে জাহাজে এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পরে ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ছয়মাসে কবি যে গীতিমাল্য গাঁথিয়াছেন, সে গানগুলি একেবারে স্বচ্ছ, ভারমুক্ত, ফুলেরি মত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। 'গীতাঞ্জলি'র কোন গানই এই গানগুলির মত এমন মধুর, এমন গভীর, এমন আশ্চর্য্য সরল নহে।

ইংলণ্ডে "জনসংঘাত মদিরা" স্বভাবতই মানুষকে কিছুনা কিছু চঞ্চল করিয়া দেয়, তার উপর ইংলণ্ডের গুণীরসিকসমাজের স্তবমদিরা যখন পাত্র ছাপাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই শান্তিভঙ্গকারী উত্তেজনা উন্মত্ততা হইতে আপনাকে নিবৃত্ত রাখিয়া 'তোমারি নাম বল্ব', 'ভোরের বেলা কখন এসে' প্রভৃতি সরলমধুর গান রচনা করা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া

মনে হয়! এ সকল গানের নীচে, 'Cheyne Walk, London' লেখা না থাকিলে এ গানগুলি ইংলণ্ডে রচিত, একথা মনে করাই অসম্ভব হইত। ইংলণ্ডের গুণীসমাজ কবির গলায় যে প্রশংসার মণিহার পরাইয়া দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটিমাত্র গান গীতি-মাল্যে আছে—'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'!

কবির সৌন্দর্য্য-সাধনা যেমন কড়ি ও কোমল ও চিত্রাঙ্গদার ভোগপ্রদীপ্ত বর্ণ-উজ্জ্বলতায় প্রথম সূচনা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সোনার-তরী-চিত্রার 'মানসসুন্দরী,' 'উর্ব্বশী' প্রভৃতি কবিতার বর্ণপ্রাচুর্য্যে ও বিলাসে বিচিত্র হইয়া অবশেষে ক্ষণিকার বর্ণবিরল ভোগবিরত সুগভীর স্বচ্ছতায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশঃ কবির অধ্যাত্ম সাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রতা হইতে ঐক্যে, বেদনা হইতে মাধুর্য্যে, বোধপ্রাখর্য্য হইতে সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে। উপনিষদে আছে, পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেনাস্থিতিষ্ঠেৎ। পাণ্ডিত্যকে (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নজনিত সংস্কারগত বুদ্ধিকে) দূর করিয়া বাল্যে (অর্থাৎ উপলব্ধির সারল্যে) প্রতিষ্ঠিত হও। গীতিম্যাল্যের ৩১ সংখ্যক কবিতায় আছে যে, কবি সমস্ত জীবনের পসরা মাথায় করিয়া হাঁকিয়া ফিরিয়াছেন—কে তাঁহাকে কিনিয়া লইবে? মান নয়, ধন নয়, সৌন্দর্য্য নয়। কিন্তু সংসার-সাগরতীরে যে শিশু ঝিনুক লইয়া আপন মনে খেলিতেছে, সেই তাঁহাকে বলিল "তোমায় অম্‌নি নেব কিনে।" তাহারি কাছে সব বোঝা নামিল, সেই বিনামূল্যে কবিকে কিনিয়া লইল।

তাই, "যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে, শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে," সেই সুরে গীতিমাল্যে সরল গানগুলি বাঁধা হইয়াছে।

বিনা প্রয়োজনের ডাকে
ডাক্‌ব তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধুশুধুই
পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে
বল্‌তে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে?

*　　*　　*

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে।

*　　*

জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে
রবে নামের মধু
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু॥

ব্রাউনিংয়ের The Boy and the Angel নামক একটি কবিতায় আছে যে একটি কাঠুরিয়া ছেলে বনে কাঠ কাটিত আর সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম গান করিত। সেই গান স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনতলে গিয়া পৌছিত এবং তাঁহাকে পুলকিত

করিত। তিনি স্বর্গের দেবতাদিগকে বলিতেন, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহতারা যে দিবানিশি আমার বন্দনা গান করিতেছে, সে গানের স্বর প্রাচীন, তাহা অনাদিকাল হইতে ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু ঐ যে একটি ছেলে আমায় ডাকে, ঐ ডাক আমার বুকে লাগিয়াছে—ঐ ডাকের মত মিষ্ট ডাক আর শুনি নাই।

ঈশ্বরের এই কথা শুনিয়া স্বর্গের দেবতাগণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল পাখা মেলিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিলেন এবং সেই বালকের দেহ ধারণ করিয়া সেই কাঠ কাটার কাজে নিরত রহিলেন। তিনি সেই কাঠ কাটেন এবং ঈশ্বরের নাম গান করেন।

বালক গেল মরিয়া। সে দেহান্তর ধারণ করিয়া রোমের পোপ হইল। পোপ হইয়া সে গির্জ্জায় বড় গলায় বড় স্বরে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল।

ঈশ্বর বলিলেন, আমার সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গীত যে বন্ধ হইয়া গেল। "I miss my little human voice!" আমি সেই মানবকণ্ঠটি যে আর শুনি না।

গ্যাব্রিয়েল সে স্বর কেমন করিয়া পাইবেন? আর পোপের স্বর—সেও যে স্বতন্ত্র।

গ্যাব্রিয়েল তখন লজ্জিত হইয়া পোপের প্রাসাদে আসিয়া পোপকে দেখা দিলেন। বলিলেন, আমি তোমার দেহ ধারণ করিয়া তোমার স্বর সাধিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম। আমি

পারিলাম না। যাও, তুমি তোমার স্থানে পুনরায় গিয়া পূর্ব্ববৎ ঈশ্বরের নাম গান কর।

ব্রাউনিং এই The Boy and the Angel কবিতায় যে কথাটি বলিতে গিয়াছেন তাহা ঐ একটিমাত্র "তোমারি নাম বল্‌ব" গানে তত্ত্বরূপে নয়—সেই "human voice" রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই গানেই "তোমার সিংহাসনের আসন হ'তে এলে তুমি নেমে"—এই গান সত্য হয়। এ গানে তত্ত্বের কথা নাই, সাধনার কথা নাই। এ কেবল সেই একটি ডাক—সেই একটিমাত্র ডাক এমন পরিপূর্ণ, এমন গভীর, এমন সরল যে তাহাতে এই আশ্বাস সুনিশ্চিত রূপে পাওয়া যায়ঃ—

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে
গোলাপ হয়ে উঠ্‌বে।

(৪)

গীতিমাল্যে অধ্যাত্ম সাধনার সংশয়-সংগ্রাম বেদনা-অপেক্ষা-লীলায়িত বিচিত্র অবস্থা ও অনুভাবের গান যথেষ্ট নাই, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। গীতাঞ্জলি লইতে গীতিমাল্যের এইখানেই শ্রেষ্ঠত্ব একথাও আমি বলিয়াছি।

বাস্তবিক গীতিমাল্যে কবি যেখানেই তাঁহার ভিতরকার সাধনার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেখানেই তিনি সাধনার পথ

সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে অধ্যাত্ম সাধনার যে সকল 'মার্গ' নির্দ্দিষ্ট আছে—সে সকল কোন পন্থারই তিনি পন্থী নহেন। বিবেক বৈরাগ্য বা শমদমাদি সাধন, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি যোগ সাধন, বৈষ্ণবের শান্তদাস্যাদি পঞ্চরসের সাধন,—এ কোন সাধনপ্রণালীই তাঁহার জীবনের পক্ষে উপযোগী নয়। তাঁহার পর তাঁহার আপনার পথ—কোন শাস্ত্র বা গুরুর দ্বারা সে পথ নির্দ্দেশিত হয় নাই।

ইউরোপীয় মিষ্টিক সাধকদিগের পন্থা প্রণালী বা সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সঙ্গেও তাঁহার পন্থার বা সাধনার অবস্থার কোন মিল নাই। প্রথমতঃ তাঁহারা যাহাকে 'Conversion' বলেন,—অর্থাৎ, চৈতন্যের অকস্মাৎ উদ্বোধন এবং কর্ম্মজীবনের জন্য ব্যাকুলতা, তারপর যাহাকে 'Purgative stage' বলেন—অর্থাৎ, সংসারবৈরাগ্য, পাপ-বোধ, দীনতা এবং আত্মত্যাগ; তারপর যাহাকে 'Illuminative stage' বলেন, যখন ঈশ্বরের সহবাসজনিত ভূমানন্দ সাধকের চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে যখন বহির্লোকে 'ঊর্দ্ধপূর্ণ অধঃপূর্ণ পূর্ণসর্ব্ব চরাচর' এবং চিদলোকে নানা visions বা দর্শন স্বেদকম্পপুলক প্রভৃতি রসভাবকে উদ্রিক্ত করে; এবং সর্ব্বশেষ চরম অবস্থায় যাহাকে 'Unitive stage' বলেন,—জীবাত্মা পরমাত্মায় অচ্ছেদ্য একাত্মকতা—সে সকল অবস্থালাভের জন্য সাধনপ্রণালী রবীন্দ্র-নাথের ধর্ম্মজীবনক্ষেত্রে মেলে কি না দেখিতে গেলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনপন্থা না এদেশীয় না বিদেশীয় কোন সাধন-পন্থার সঙ্গে মেলে না। ইহাকে Subjective Individualism বল, স্বানুভূতি বল, আর যাই বল—তাহাতে কিছুই আসে যায় না। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যে কোন সাধক যথার্থ কোন সত্য উপলব্ধিতে আসিয়া পৌছিয়াছেন এবং কোন সত্যবাণী প্রচার করিয়াছেন—তিনি আপনার পথেই আপনি চলিয়াছেন। দশের পথে যান্ নাই—শাস্ত্রবাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া মানেন নাই—গুরুকরণ করিয়া গুরুর হাতেই আপনার বুদ্ধিকে গচ্ছিত রাখেন নাই—একেবারে তীরের মত সোজা সেই পরমলক্ষ্যে গিয়া বিদ্ধ হইয়াছেন। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। সেই তন্ময়তা যে কোথা হইতে তাঁহারা পাইয়াছিলেন, যাহাতে বিষয়তৃষ্ণা আপনি বিনা চেষ্টায় তিরোহিত হইয়াছে, প্রেম সর্ব্বভূতে আপনি প্রসারিত হইয়াছে, এবং হৃদয়গ্রন্থিসকল আপনি ছিন্ন হইয়াছে, তাহার কোন ইতিহাস নাই। পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সাধনার ধাপ অনুসরণ করিয়া কোন বড় সাধকের সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয় নাই। আগে Purgative, পরে Illuminative, পরে Unitive—এমন করিয়া ধাপে ধাপে খৃষ্টীয় কোন সাধকেরও সাধনের অবস্থাগুলি উন্নীত হয় নাই। শাস্ত্র, গুরু, মার্গ—এ সমস্ত দশের জন্য। তাহাদের পক্ষে Individualism বা ব্যক্তিতন্ত্রতা সত্য নহে কিন্তু যিনি আপনার পথে আপনি চলিবেনই চলিবেন এবং সেই চলার দ্বারাই যাঁহার উপলব্ধি গভীর হইতে গভীরতর হয়, তাঁহার পক্ষে নিজের পথে চলায় বিপদ কোথায়? তিনিই তো আসল

Individual বা ব্যক্তি—তাঁহার Individualism বা ব্যক্তিতন্ত্রতা তো যথার্থরূপে সার্থক; কারণ তাহা তাঁহাকে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিয়া তুলিবেই তুলিবে। সত্যে, আনন্দে, কল্যাণে, পূর্ণতায় ব্যক্ত করিয়া তুলিবে। গীতিমাল্যে তাই কবি কোথাও ব্যর্থতার কান্না কাঁদেন নাই—তিনি বেশ জোরের সহিতই বলিয়াছেন :—

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।

পথ আমারে পথ দেখাবে! সে পথ একমাত্র Individual এর নিজস্ব পথ—সে পথের সঙ্গে অন্য কাহারো কোন পথের সাদৃশ্য নাই।

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস্‌নি যে
ফিরে যারে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে
আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে।
জানিনাই গো সাধন তোমার
বলে কারে:

'জ্ঞানী' হচ্ছেন সেই সব লোক যাঁহারা বিচারে প্রবৃত্ত হন, এ সাধনা 'বস্তুতন্ত্র' কি না, এটা Subjective Individualismএর কোটায় পড়ে কি না এবং যদি পড়ে তাহা হইলে এ সাধনার শেষফল কি দাঁড়াইবে—ইত্যাদি। এই সকল লোক একটা সোজা মোটা কথা ভুলিয়া যায় যে জীবন জিনিসটা কোন শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ধরা দিবার মত জিনিস নহে। সূর্য্যাস্তের সময়ে মেঘের মধ্যে যখন বর্ণচ্ছটার পর বর্ণচ্ছটা হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতে থাকে, তখন সেই সকল সূক্ষ্ম বর্ণবিভঙ্গের শ্রেণীনির্দ্দেশকার্য্য যেমন কোন মতেই সম্ভাবনীয় নহে, কারণ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন দেখা দেয়—সেইরূপ জীবন যেখানে স্বভাবত বিকাশ লাভ করিতেছে, সেখানে তাহার নিত্যনবীন অভাবনীয় গতিশীল পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্যকে তত্ত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া শ্রেণীর খোপের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। জীবন্ত সাধনার কতটুকু Subjective বা আত্মতন্ত্র, কতটুকু Objective বা বস্তুতন্ত্র—এ সকল বিচাব করিতে যাওয়াই মূঢ়তা মাত্র। এতো জড়বস্তু নয় যে স্বতন্ত্র কোটায় গুঁজিয়া রাখা যাইবে—এ যে জৈববস্তু—এ যে নিত্যক্রিয়াশীল, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল। তাই কবি বড় খেদে বলিয়াছেন :—

> ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
> তোমার কথা আমি বুঝি
> তোমার আকাশ তোমার বাতাস
> এইত সবি সোজাসুজি।

হৃদয়কুসুম আপনি ফোটে
জীবন আমার ভ'রে ওঠে
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি।

কাণ্টের categories ভাঙিবার জন্য আধুনিক যুগে ব্যার্গসঁর অভ্যুদয় হইয়াছে। কাণ্ট আইডিয়াকে স্থিত দেখিয়াছিলেন, ব্যার্গসঁ তাহাকে চিরচঞ্চল চিরগতিশীল বলিয়া প্রমাণ করিতে চান্। হেগেল Dialectic movement—তত্ত্বে চিন্তার গতিশীলতা প্রতিদান করিলেও, নামের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। আশা করা যায় যে এক সময়ে আমাদের দেশে যেমন বৈষ্ণব আচার্য্যেরা দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের বিচিত্র বাদানুবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' নামক এক অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোন তত্ত্ব ইউরোপেও উদ্ভাবিত হইবে। Vitalism একালের সেই তত্ত্ব। "Not law but aliveness, incalculable and indomitable is their motto ; not human logic, but actual human experience is their text. * * The vitalists see the whole cosmos as instinct with spontaniety as above all things free." অর্থাৎ নিয়ম নহে, কিন্তু অপরিমাণ ও অদম্য প্রাণময়তা এই তত্ত্বের আদর্শ ; এই তত্ত্বের কথা এই যে, লজিকের দ্বারা কোন সত্য স্থিরীকৃত হয় না, বাস্তব অভিজ্ঞতাই সত্য নির্দ্ধারণের মানদণ্ড। এই তত্ত্বের তাত্ত্বিকগণ সমস্ত

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বতোস্ফূর্ত্ত দেখেন—তাহা কোন নিয়ম-নিগড়ের দ্বারা কোথাও বদ্ধ নহে, সর্ব্বত্র মুক্ত। এককথায় এই তত্ত্ব বলে যে জীবন সকল তত্ত্বের চেয়ে বড়। এই নূতন জীবন-তত্ত্বই এই বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারে :—

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবেনা
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।

এই জীবনকে যতই জানা যাইবে, ততই জীবনের জীবনকেও বেশি করিয়া চেনা যাইবে। কারণ জীবনই একমাত্র তত্ত্ব। হুইটম্যান তাঁহার Assurances নামক কবিতায় বলিয়াছেন, I know that exterior has an exterior and interior has an interior—(আমার ছত্রটি ঠিক স্মরণে নাই)—আমি জানি যে যাহাকে বাহ্য বলি তাহারও একটি বাহির আছে, যাহাকে অন্তর বলি তাহারও একটি অন্তর আছে। সমস্ত বিশ্বতত্ত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই অসীমের তত্ত্ব আরও স্ফুটতর হইবে। যেমন অধুনা বিজ্ঞানের দ্বারা হইতেছে। আত্মতত্ত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমাত্মতত্ত্ব আরও ব্যক্ততর হইবে। "এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"

(৫)

অনেকদিন হইতেই আমাদের দেশে দুইটি সাধনায় বিরোধ চলিতেছে—এক নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাধনা, আর

একটি বৈষ্ণব সাধনা, অর্থাৎ রূপরসের নিবিড় উপলব্ধির ভিতর দিয়া অতীন্দ্রিয় রসস্বরূপের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা। কেবলমাত্র তত্ত্বমাত্রসার সাধনায় শুষ্কতা আনে, কেবলমাত্র ভক্তিরসবিহ্বল সাধনায় মাদকতা আনে। এ দুয়ের মিলন চাই। কিন্তু সে মিলন তত্ত্বে হইলে চলিবে না। জীবনে হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই দ্বন্দ্বের সমাধান আমরা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

গীতিমাল্যের শেষ গানগুলিতে তাহার আভাস পাই।

ওদের সাথে মেলাও যারা
　　চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা বাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
　　কেন আমি কিসের লোভে এনু।
কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে
　　পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু।

এ গান কোন ভক্ত বৈষ্ণবের রচনা হইতে পারিত।

কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গানের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি। সে গানটি কোন মতেই কোন বৈষ্ণবের দ্বারা রচিত হইতে পারিত না।

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণুপরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

* * *

সে যে প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগযুগান্তরের স্তন্য
ভূবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

এই নরদেহ গড়িয়া উঠিবার অভিব্যক্তির ইতিহাসের স্তরে স্তরে যে ভগবানের আনন্দলীলা বিরাজিত তাহা উপলব্ধি করা এ কালের কবি ভিন্ন আর কোন কালের কবির দ্বারা সম্ভাবনীয় ছিল না। ভগবানের অসীম আনন্দকে সীমারূপের মধ্যে নিবিড় করিয়া উপলব্ধি বৈষ্ণব কবির মধ্যে আমরা দেখিয়াছি। আবার সেই সীমারূপকে অসীম দেশে ও অসীম কালে ব্যাপ্ত করিয়া সীমার মধ্যে অসীমতাকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি একালের ভক্ত কবিদের মধ্যে দেখিতেছি। টেনিসনের Flower in the crannied wall. ব্লেকের To see a world in a grain of sand—ই শেষোক্ত উপলব্ধির কাব্যের নমুনা! 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ' এই শ্রেণীর কবিতা। ইহা হুইট্‌ম্যান, এড্‌ওয়ার্ড কার্পেণ্টার লিখিতে পারিতেন। এ কাব্য এভোল্যুশনে জীবলীলার কাব্য।

গীতমাল্যের সম্বন্ধে আমার আলোচনা শেষ করিলাম। গীতিমাল্যের পরে আমরা আর কি শুনিব? কিন্তু কবির প্রার্থনা তো আমরা জানি :—

সুরে সুরে বাঁশী পুরে
মোরে আরো আরো আরো দাও তান।

অতএব আমরাও সেই 'আরো আরো আরো'র অপেক্ষায় রহিলাম।

———

পরিশিষ্ট

জীবন-দেবতা

"জীবন-দেবতা" প্রবন্ধে আমরা জীবতত্ত্বের যে সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছি, তাহা পণ্ডিত সমাজে এখন অগ্রাহ্য। জীবতত্ত্বে লামার্ক প্রভৃতির মত ছিল যে এক আদিম জীবকোষই অভিব্যক্তির ফলে খাদ্য, জলবায়ু ও পরিবেষ্টনের (environment) নানা বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন জীবশ্রেণীতে (species) ক্রমে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে লামার্কের "Gelatinous bodies" অথবা হেকেলের (Haeckel) "moneron" ইহারা কেহই আদিম জীবকোষ নহে। আদিম জীবকোষ এক নহে। গরিল্লা বা শিম্পাঞ্জী হইতে যে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে বা জীবজন্তু উদ্ভিদ হইতে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে, এ মত এখন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা অস্বীকার করিয়াছেন। এখন প্রায় সকলেই বলিতেছেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর জীবকোষের মধ্যেই তার স্বাতন্ত্র্য বা বৈষম্যের কারণ বা বীজ সুপ্ত থাকে। কোথাও আমরা ইহা ধরিতে পারি, কোথাও পারি না।

শুধু জীবতত্ত্ব নয়, মনস্তত্ত্বেও (Psychology) ঠিক এই রকম একটা মতের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কণ্ডিল্লাক (Condillac)

মনে করিতেন যে আমাদের মনের বিচিত্র ভাব সকল এক অখণ্ড আদিম চৈতন্য হইতে ক্রমে ধারাবাহিকরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। এমন কি বেইন (Bain) ইহা অস্বীকার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, যে বুদ্ধি (intellect), ইচ্ছা (will) প্রভৃতির চিহ্ন গোড়াতেই আমাদের চৈতন্যের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করা যায়। আঁরি বার্গস তো বলেন যে বুদ্ধি (intellect) ও বোধি (intuition) চৈতন্যের প্রথম অবস্থা হইতেই বিভিন্ন। ক্রমশঃ সেই ভিন্নতা স্ফুটতর হয় মাত্র। বোধি হইতে কখন বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে না বা বুদ্ধি অভ্যাসগত হইয়া কখনো বোধি হইয়া পড়ে না।

ক্রম-উদ্ভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণী (species) ও বিভিন্ন মনোবৃত্তির (faculties) স্বাতন্ত্র্য যদি গোড়াতেই মানিয়া লই, তথাপি জীবন দেবতার মূল কথাটির সহিত তাহার বিশেষ কোন বিরোধ আমি আশঙ্কা করি না। মানুষের চৈতন্যের বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে এক পরম ঐক্য স্পষ্ট বিদ্যমান, ইহা তো কেহই কোনরূপে অস্বীকার করিতে পারে না। বৈচিত্র্য যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, ঐক্যও ততই ব্যাপক ও গভীরতর হইয়া সেই সমস্ত জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যকে এক চরম সমাধানের মধ্যে সার্থক করিবে।

এক অনন্ত বিশ্বচৈতন্যই, জড়ে, উদ্ভিদে, ও জীবে আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। অভিব্যক্তির ফলে, মানবাত্মা যতই এই বিশ্বাত্মা বা বিশ্বচৈতন্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ততই তার উপলব্ধির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-উপলব্ধি যে ক্রমে এই বিশ্বব্যাপকতা লাভ করিয়া ফেক্‌নার-কথিত বিশ্ব-

চৈতন্যের সহিত একটা প্রাণময় যোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় কি? বহুবিধ ব্যক্তিত্বের (multiple personality) বিচিত্র সমাবেশও এই কারণেই তাঁহার এক ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া যে প্রকাশমান হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তাঁহাকে মানিতেই হয়। সুতরাং জীবন-দেবতার এই মূলতত্ত্বটির সঙ্গে বর্ত্তমান জীবতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের সিদ্ধান্তের কোথাও কোন বিরোধ নাই।